অধরচন্দ্র মুখার্জি বক্তৃতা

বাঙ্গলার বৈষ্ণব ধর্ম্ম

মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯৩৯

Published by the University of Calcutta and Printed at Sree Saraswaty Press Ltd., 1, Ramanath Mazumder Street, Calcutta by S. N. Guha Ray, B.A.

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিষয়			পৃষ্ঠা
অবতরণিকা	...	...	৵০
বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তি, গতি ও প্রসার		...	১
জ্ঞানমার্গ	...	...	২
জ্ঞান ও ভক্তির দুইটী ধারা	...	...	৪
চার্ব্বাক মত	...	...	৫
আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব	...	...	৭
কর্ম্মের অনিত্যফলতা	...	...	৮
ব্রহ্মতত্ত্ব	...	...	৯
জ্ঞান ও ভাবের পরিচয়	...	...	১০
শ্রৌতকর্ম্মে বিতৃষ্ণা	...	...	১২
বৌদ্ধমতের আবির্ভাব	...	...	১৩
অদ্বৈতবাদ	...	...	১৬
ভাবমুখী প্রেরণা	...	...	১৫
রসতত্ত্ব ও ভক্তি	..	..	১৭
বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিভিন্নমুখী গতি	...	...	১৯
জ্ঞানমুখী ও ভাবমুখী দ্বিবিধ প্রেরণার সমন্বয়		...	২১
ভাগবতে ভক্তির উৎকর্ষ		...	২৫
ভাগবতের সহিত গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের সমন্বয়		...	২৬
ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের একত্ব বিষয়ে গীতার সিদ্ধান্ত			২৮

বিষয়		পৃষ্ঠা

আর্যযুগের ও দার্শনিক যুগের বৈষ্ণব ধর্ম্মের স্বরূপ	...	২৯
শ্রীমদ্‌ভাগবতের রচনাকাল	...	৩০
তামিলদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ ও আলবার সম্প্রদায়		৩১
আলবার সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ	...	৩২
আচার্য্য কুলশেখর	... ..	৩৩
দ্রমিড়োপনিষৎ বা দ্রাবিড়াম্নায়	...	৩৫
শঠারি আচার্য্যের ভক্তিবাদ	...	৩৬
রাগানুগা ভক্তির পরিচয়	... ...	৩৮
আলবার সম্প্রদায়ের গ্রন্থ দ্রবিড়োপনিষৎ তাৎপর্য্য	...	৪১
বেদান্ত দেশিকাচার্য্যের মতে রাগানুগাভক্তির স্বরূপ	...	৪৩
ভাগবতে গোপীভাব	...	৪৪
উদ্ধব সন্দেশের সারমর্ম্ম	...	৪৫
ভাগবতোক্ত গোপীভাব শ্রীরামানুজ ও মধ্বাচার্য্য কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই	... ...	৪৭
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গোপীভাব	...	৪৮
শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব	... ...	৪৯
চৈতন্যদেব সম্বন্ধে স্যার. আর. জি. ভাণ্ডারকর মহাশয়ের উক্তি		৫২
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ		৫৩
শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ বিষয়ে ভাগবত সিদ্ধান্ত	...	৫৪
চৈতন্য চন্দ্রোদয় গ্রন্থে চৈতন্যদেবের স্বরূপ	...	৫৫
চৈতন্যদেবের অবতারত্ব	... ...	৫৬
চৈতন্যদেবের চরিতানুশীলন	... ...	৫৭
তাঁহার বাল্যলীলা	... ...	৫৮
তাঁহার কিশোরলীলা	... ...	৫৯
চৈতন্যদেবের গয়াতীর্থযাত্রা	... ...	৬০

বিষয়			পৃষ্ঠা

তাঁহার গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন … ৬১
সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বাবস্থা … … ৬২
কেশব ভারতীর সমাগম ও তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ ৬৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

চৈতন্যদেবের পার্শ্বদগণের পরিচয় ও গোস্বামীত্রয় ৬৫
শ্রীসনাতন ও রূপ গোস্বামীর সহিত চৈতন্যদেবের মিলন ৬৭
প্রকাশানন্দ স্বামী … … ৭০
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু … … ৭১
অদ্বৈত প্রভু … … ৭৩
মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অদ্বৈতাচার্য্যকে শিক্ষা প্রদান ৭৬
ছোট হরিদাস … … ৭৮
রামানন্দ রায় … … ৭৯
শ্রীজীব গোস্বামীর ভাগবত সন্দর্ভ গ্রন্থ … ৮১
ভাগবত সন্দর্ভে শ্রীভগবত্তত্ত্ব … ৮২
গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে সগুণ ও নির্গুণ শ্রুতির সমন্বয় … ৮৫
ভাগবত সন্দর্ভে ব্রহ্মতত্ত্ব … … ৮৮
ব্রহ্মের বিবিধ শক্তি … … ৯১
অচিন্ত্য ভেদাভেদ বিচার … … ৯২
ভেদাভেদের অচিন্ত্যত্ব শব্দের অর্থ … ৯৩
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় রামানুজ বা মাধ্ব সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট নহে ৯৯
শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তির বিচার … ১০১
অর্থাপত্তি প্রমাণ … … ১০২
গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে অভেদজ্ঞানের সহিত ভক্তির সম্বন্ধ ১০৫
হ্লাদিনীশক্তির পরিচয় … … ১০৮

বিষয় | পৃষ্ঠা

ভগবানের আনন্দ ও রসরূপতা ১১০
ভগবদ্‌রতি জীবের স্বতঃসিদ্ধধর্ম্ম ... ১১২
ভগবদ্‌রতির সহিত হ্লাদিনীর সম্বন্ধ ... ১১৪
শরণাগতি বা প্রপত্তির স্বরূপ ... ১১৬
ভগবৎ কৃপা বিনা ভগবদ্‌রতির উদয় হয় না ... ১১৭
গুরু, দেবতা ও ভক্তের পরস্পর সম্বন্ধ ... ১১৯
বৈরাগ্যের ভেদ ১২১
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ... ১২২

অবতরণিকা

বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্ম বিষয়ে অনুশীলন করিবার ভার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। এই জন্য আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ তাঁহাদিগকে নিবেদন করিতেছি।

যে ভার অর্পিত হইয়াছে, তাহা গুরুতর এবং আমার ন্যায় অল্পজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে তাহা দুর্ব্বহ, ইহা জানিয়াও আমি উৎসাহ ও আনন্দের সহিত ইহা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছি। কেন যে উদ্যত হইয়াছি, তাহা বলি। অধ্যাত্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যার উৎপত্তি, স্থিতি, প্রসার ও সমুন্নতির লীলাক্ষেত্র এই দেববাঞ্ছিত ভারতবর্ষ। এখানে বর্ত্তমান কালের পাশ্চাত্য আদর্শে সংস্থাপিত ও পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীনতম ও প্রধানতম। ঊনবিংশ ও বিংশশতাব্দীয় বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর বড় সাধের বড় গৌরবের সারস্বতসাধনার ইহা মহাপীঠ। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বজন-হিতকর সময়োপযোগী নানাপ্রকার শিক্ষাদানরূপ মহাব্রতের পুণ্যকীর্ত্তিনিচয়ে আজ ভারতীয় দিগদিগন্ত সমুদ্ভাসিত। এই পুণ্য প্রতিষ্ঠান প্রাতঃস্মরণীয় মূর্ত্ত সরস্বতীর সাক্ষাৎ লীলানিকেতন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্মের মৌলিকতত্ত্ব বিষয়ে বাঙ্গালাভাষায় কিছু অনুশীলন করিবার অধিকারলাভ যে বিশেষ গৌরবাবহ, সুতরাং বিশেষ স্পৃহণীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতীয় আত্মার যথার্থ পরিচয় ভারতকে আবার পাইতেই হইবে, অদূর ভবিষ্যতে ভারত যে তাহা পাইবে তাহাও নিশ্চিত। সেই পরিচয়ই ভারতকে পুনরায় তাহার অনন্যসাধারণ-গৌরবমণ্ডিত ও বিশ্ববন্দিত নিজমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। ভারতীয় আত্মার অসাধারণ মহত্ত্বের যথার্থ পরিচয় অগণিত-বিশুদ্ধসত্ত্ব-ভারতীয় নরনারীর—বিশ্বাত্মা শ্রীভগবানের প্রতি, স্বার্থগন্ধবিরহিত অকৈতব প্রেমের পরিচয়ের উপরই বহুল ভাবে নির্ভর করে। সেই স্বার্থগন্ধ-বিরহিত অকৈতব ভগবৎ প্রেমের নবদ্বীপে, নীলাচলে ও শ্রীবৃন্দাবনে সাময়িক পূর্ণ বিকাশেরই নামান্তর বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্ম বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম। এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্তর্নিহিত মৌলিকতত্ত্বের শ্রবণ, মনন ও অনুধ্যান প্রত্যেক শিক্ষিত নরনারীর বিশেষতঃ বাঙ্গালী নরনারীর অবশ্য কর্ত্তব্য। এই শ্রবণ, এই মনন ও এই অনুধ্যানের সাহায্য ব্যতিরেকে বাঙ্গালী জাতির যথার্থ আত্মপরিচয় লাভ করিবার অন্য কোন উপায় নাই, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এই আত্মপরিচয় লাভের যৎকিঞ্চিৎ আনুকূল্য করিতে আমি সাহসী হইয়াছি, ইহার পরিণাম কি হইবে তাহা ভাবিবার অধিকার আমার নাই, কেমন করিয়া এই জাতীয় ভার বহন করিতে হয় তাহার সন্ধানও সেই দীন দয়াল প্রেমের ঠাকুরই বলিয়া দিয়াছেন।

"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎতপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্।
শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ"॥

(গীতা ৯ম ২য় শ্লোক)

বৈষ্ণবধর্ম্ম ও ঋগ্‌বেদ।

বৈষ্ণবধর্ম্ম বেদমূলক। বিষ্ণুর উপাসনা বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রমাণ ঋগ্‌বেদ সংহিতা। ঋগ্‌বেদ সংহিতার মধ্যে অনেকগুলি বিষ্ণু-সূক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে কয়েকটী সূক্তের গুটিকয়েক মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

"তমু স্তোতারঃ পূর্ব্ব্যংযথাবিদঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন।
আস্য জানন্তোনাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে"

ইহার সায়নাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যানুবাদ—হে স্তোতৃগণ,তোমরা সেই বিষ্ণুকে যতটুকু জান, তদনুরূপ স্তোত্রাদিদ্বারা তাঁহাকে প্রীত কর। তিনি সকলের আদি, তিনিই যজ্ঞরূপে অবস্থিত, তিনিই সর্ব্বাগ্রে জল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারই অনুগ্রহ হইলে তাঁহার স্তুতি করিতে পারা যায়। তাঁহার নামই সকলের উপাস্য ও জ্যোতির্ম্ময়। সেই নামকে সকল প্রকার পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায় জানিয়া তাহারই উচ্চারণ করিতে থাক। হে বিষ্ণো, এইভাবে তোমার নাম করিতে করিতে আমরা তোমারই কৃপায় তোমার স্বরূপ সাক্ষাৎকাররূপ সুমতি লাভ করিতে সমর্থ হইব।

এই মন্ত্রটীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের ব্যাখ্যা শ্রীজীবগোস্বামী ভগবৎ সন্দর্ভে এইরূপ করিয়াছেন ঃ—হে বিষ্ণো তব নাম চিৎ— চিৎস্বরূপং অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপং। তস্মাৎ অস্য নাম্ন আ ঈষদপি জানন্তঃ নতু সম্যক্ উচ্চারমাহাত্ম্যাদিপুরস্কারেণ তথাপি বিব্রুবন্ ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণাঃ সুমতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ॥

(হে বিষ্ণো তোমার নাম চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপ এবং সেই হেতু তাহা মহঃ অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশ, সেই নামের ঈষৎও মহিমা জানিয়া অর্থাৎ উচ্চারণাদির মাহাত্ম্যাদি পূর্ণভাবে না জানিয়া ও যদি কেহ উচ্চারণ করে, তবে সেও তোমার বিদ্যা বা সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয়)

"পূমর্ত্তোদয়তে সনিষ্যন্ যো বিষ্ণব উরুগায়ায় দাশত্।
প্রযঃ সপ্রাচা মনসা জাত এতাবন্তং নর্য্য মা বিবাসাৎ" ॥

অভীষ্ট ধন লাভ করিতে যে চাহে, সে যদি উরুগায় শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশে দান করে, তবে তাহার অভীষ্ট ধন লাভ অনায়াসে হইয়া থাকে, মননের সহিত তাঁহার স্তুতি করিলে তিনি শীঘ্র অভীষ্ট ফল প্রদান করেন।

"ত্বং বিষ্ণো সুমতিং বিশ্বজন্যাং অপ্রযুতামেবযাবোমতিংদাঃ।
পর্চো যথা নঃ সুবিতস্য ভূরেরশ্বাবতঃ পুরুশ্চন্দ্রস্য রায়ঃ ॥"

হে স্তোতৃবৃন্দের কামনা-পূরক বিষ্ণো, আমাকে সেই সুমতি প্রদান কর, যাহা দ্বারা আমি সকল জনেরই হিত করিতে সমর্থ হই। হে বিষ্ণো, বহুজনের প্রীতিপ্রদ প্রভূত অশ্বাদিযুক্ত এমন ধন সম্পদ্ যেন আমার হয়; যাহা দ্বারা আমি বহুজনের সেবা করিতে সমর্থ হই।

"ত্রিদে´বঃ পৃথিবীমেষ এতাং বিচক্রমে শতর্চ্চসংমহিত্বা।
প্রবিষ্ণুরস্তু তবসস্তবীয়ান্ ত্বেষং হ্যস্যস্থবিরস্যনাম" ॥

শত জ্যোতিঃ সম্পন্ন লোকত্রয়কে যিনি মহিমা দ্বারা আক্রমণ করিয়া ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, সেই প্রাচীনগণের মধ্যে প্রাচীনতম বিষ্ণু আমার প্রভু হউন,, তাঁহার নাম

জ্যোতির্ম্ময়, তিনি আমাদের সকলেরই প্রভু হইবার যোগ্য।

এই প্রকারের বহু মন্ত্র ঋক্‌সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়, বিস্তার ভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। যে কয়টী মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত অপরিবর্ত্তনীয় স্বরূপ তাহাতেই সুব্যক্ত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্বজনীন মঙ্গল যাহা দ্বারা হইতে পারে আমার,এমন সুমতি তোমার অনুগ্রহে হৌক। আমার প্রভূত ধন হৌক, সেই ধনের দ্বারা যেন আমি বহুজনের সুখ সম্পাদন করিতে সমর্থ হই। শ্রীবিষ্ণুর নাম দীপ্তিময় ও চৈতন্যস্বরূপ, সেই নামের মাহাত্ম্য বা অর্থ না জানিয়া ও যদি কেহ তাহা উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সেই নামের প্রতিপাদ্য ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পূর্ণ মনোরথ হইয়া থাকে। শ্রীবিষ্ণুর নাম বা লীলা বহু লোক কর্ত্তৃক একসঙ্গে গীত হয় এবং এইভাবে নাম বা লীলা-গান তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকে। উল্লিখিত কয়টী মন্ত্রে বৈষ্ণব সাধকোচিত এই প্রকার যে মনোবৃত্তি প্রকাশিত হইতেছে, তাহাকেই প্রধান ভাবে অবলম্বন করিয়া সকল বৈষ্ণব সাধনা অতি প্রাচীনকাল হইতে এই ভারতে আত্মলাভ করিয়াছে, ইহা অভিজ্ঞব্যক্তিমাত্রেরই বিদিত।

শ্রুতিতে যাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা হইয়াছে, সেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধানতম সাধন—নাম কীর্ত্তন—পুরাণেও পরবর্ত্তি-কালে সমধিকভাবে প্রশংসিত ও বিহিত হইয়াছে এবং সেই নামোচ্চারণরূপ বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠানে সকল মনুষ্যেরই সমান অধিকার আছে, ইহাও পুরাণে নানা প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। তাই স্কন্দপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় —

মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল-নিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥

অগ্নিপুরাণে দেখা যায়—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও আছে—

এতন্নির্বিদ্যমানানাং ইচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্নীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥

পরকে সুখী করিবার জন্য স্বার্থত্যাগ, ইহাই হইল বৈষ্ণবতার বিশেষ লক্ষণ। ঋক্ সংহিতার উল্লিখিত মন্ত্র কয়টীতে এই অসাধারণ বৈষ্ণব লক্ষণের স্পষ্ট সূচনা রহিয়াছে। এই জাতীয় বৈষ্ণবভাবের উৎকর্ষ শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতি পুরাণেও পর্য্যাপ্তভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে পরমভাগবত শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তির মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় ॥

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরা
মষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তীঃ প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজা
মন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ ॥

অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যযুক্ত পরমপদপ্রাপ্তি বা নির্ব্বাণ আমি ঈশ্বরের নিকট চাহি না। আমি চাহি, সকল প্রাণীর অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের যত প্রকার আর্ত্তি আছে, আমি যেন তাহা

সকলই নিজ আত্মাতে গ্রহণ করিতে পারি, এবং তাহাতে যেন তাহাদের সকল প্রকার দুঃখ দূর হয়।

এই যে পরদুঃখ-প্রহাণেচ্ছা এবং নিজে সকলের দুঃখ-বহনেচ্ছা, ইহা হইল প্রকৃত বৈষ্ণবতা। শ্রৌতযুগেও যে এই বৈষ্ণবভাব সমুদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিল তাহার প্রমাণ ঋগ্‌বেদ-সংহিতার উদ্ধৃত ঋক্ কয়টীতেও দেখা যায়। ইহারই উত্তরোত্তর পুষ্টি ও উৎকর্ষ স্মার্ত্ত ও পৌরাণিকযুগে ধারাবাহিক-ভাবে হইয়া আসিতেছে, এই শ্রৌত বৈষ্ণবধর্ম্ম মহাভারতের যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া পাঞ্চরাত্রিক সাত্বত ধর্ম্ম বা ভাগবত ধর্ম্ম আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিষ্ণু এই শ্রৌত নামের পরিবর্ত্তে বাসুদেব কৃষ্ণ এই নামে উপাস্য দেবতার স্তুতি ধ্যান ও তদুদ্দেশ্যে জপ, হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠান ও প্রচুর ভাবে হইয়াছিল। এই সময়ে আগম বা পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের প্রচার যথেষ্টভাবে হইয়াছিল। উপাসনা, ধ্যান, দীক্ষা, সংস্কার, পুরশ্চরণ প্রভৃতি নানাবিধ বিধানের সঙ্গে এই পাঞ্চরাত্র যুগে মন্দির প্রাসাদ প্রভৃতির নির্ম্মাণ, দেবমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা, জীর্ণোদ্ধার, পূজক ও সেবক বিভাগ প্রভৃতি দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্ম অতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই সকল পরিবর্ত্তনশীল অঙ্গবিস্তৃতির যুগেও নামকীর্ত্তন, পরার্থে স্বার্থত্যাগ, সার্ব্বজনীন করুণা প্রভৃতি ইহার অপরিবর্ত্তনশীল স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই এবং ঐ সকল বৈষ্ণবভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইয়া আসিয়াছে। এই প্রাচীনতম শ্রৌত বৈষ্ণবধর্ম্ম কিন্তু এই গ্রন্থের মুখ্য আলোচ্য বিষয় নহে। এই গ্রন্থে সেই শ্রৌত বৈষ্ণবধর্ম্মেরই উপর প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্মই প্রধানভাবে আলোচিত হইবে। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর

আবির্ভাবের পূর্ব্বেও বাঙ্গলায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার ছিল। সেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ কি ছিল তাহা জানিতে হইলে বিষ্ণুযামল প্রভৃতি তন্ত্র গ্রন্থেরও অনুশীলন আবশ্যক।

বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্মের আরম্ভ ও প্রসার কিরূপে হইয়াছিল, তাহাও বুঝিতে হইবে। দার্শনিক দিক্ দিয়া এবং রসতত্ত্বের দিক্ দিয়া প্রাচীনকালের সেই শ্রৌত বৈষ্ণব ধর্ম্ম কখনও জ্ঞানপ্রবণ প্রেরণায় আবার কখনও ভাবপ্রবণ প্রেরণায় বিশ্বজনীনপ্রেমরূপ দুরবগাহ গম্ভীর মহাসমুদ্রেব অভিমুখে যেভাবে অগ্রসর হইতেছিল, সেদিকেও অবধান দেওয়া একান্ত আবশ্যক। এই কারণে এই প্রবন্ধে এই কয়টী বিষয়েরই আলোচনা বিস্তৃতভাবে করা হইবে।

প্রথম অধ্যায়

মন্ত্র অর্থাৎ ঋগ্‌বেদ সংহিতায় বৈষ্ণবধর্ম্মের যে আভাস পাওয়া যায়, পরবর্ত্তী যুগে তাহাই উত্তরোত্তর প্রসার পাইয়াছে। উপনিষদে, মহাভারতে, আগম শাস্ত্রে, পুরাণে এবং ধর্ম্মসংহিতাতে তাহার নানামুখী গতিরও সুব্যক্ত পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণবধর্ম্মের বিভিন্ন প্রকার প্রসারের বিস্তৃত আলোচনা এই অল্পপরিসর প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। কিন্তু মূল শ্রুতিরূপ উৎস শ্রুতি হইতে জন্মলাভ করিয়া ধীরে ধীরে বাড়িতে বাড়িতে, ইহার একটী দুর্জ্জয় বেগময় ও ক্রম-বিস্তারশীল অবিচ্ছিন্নপ্রবাহ অবিরামগতিতে বৈষ্ণবধর্ম্মের সারভূত বিশ্বজনীন ভগবৎপ্রীতিরূপ রসামৃতসিন্ধুর দিকে যে ছুটিতেছে, তাহাই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিবার বিষয়। বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুশীলনকারীর পক্ষে এই অবিচ্ছিন্ন ভাবধারার প্রবাহের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় একান্ত আবশ্যক। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায় মহর্ষি নারদ ব্রহ্মবিৎ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিয়াছিলেন—ভগবন্! আমাকে এমন উপদেশ প্রদান করুন, যাহা দ্বারা আমি সকল প্রকার দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি। সনৎকুমার ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন,—অগ্রে জানিতে চাহি, তুমি কতদূর জানিতে পারিয়াছ। তাহা বুঝিয়া পরে যদি কিছু বলিবার থাকে, তাহা তবে তোমাকে বুঝাইতে পারি।

ইহার উত্তর প্রসঙ্গে নারদ নিজের জ্ঞাত বিষয় সমূহের একটী বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি এক ব্রহ্ম ব্যতিরেকে এ সংসারে মানবের জ্ঞেয় প্রায় সকল বিষয়ই বুঝিয়াছিলেন। তিনি অঙ্গ ও উপাঙ্গের সহিত চারিটী বেদই যথাবিধি গুরূপদেশানুসারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে, তৎকালে সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয় ভারতের যাবতীয় বিদ্যাতেই তাঁহার পূর্ণভাবে অধিকার লইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষাও মিটে নাই। সংসারের সকল প্রকার শোকতাপ মিটাইবার উপায় তিনি খুঁজিয়া পান নাই। তাই তিনি আপনাকে শোকসাগরে নিমগ্ন বলিয়াই বোধ করিতেছিলেন। মহাজনের মুখে তিনি শুনিয়াছিলেন যে, এই দুস্তর শোকসাগরের পরপারে লইয়া যাইতে পারে একমাত্র ব্রহ্মবিজ্ঞান, সেই ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিবার আশায় তিনি শিষ্যভাবে সনৎকুমারের শরণাগত হইয়াছিলেন।

নারদের এই ভাবে আত্মনিবেদনের পর ব্রহ্মবিত্তম সনৎকুমার যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে আছে। সেই উপদেশের শেষাংশে দেখিতে পাওয়া যায়—

যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি নাসুখং লব্ধ্বা করোতি
সুখমেব লব্ধ্বা করোতি সুখংত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্

সনৎকুমার বলিলেন মানুষ যদি সুখকে লাভ করিতে পারে (এইরূপ বুঝে), তবেই সে কার্য্য করিতে উদ্যত হয়। যদি বুঝে ইহাতে সুখ পাওয়া যাইবে না, তবে সে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না। সুখ লাভ করিবার আশাতেই মানুষ কার্য্য

করিতে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সুখ কি তাহাই জানিতে হইবে।

তখন নারদ বলিলেন—সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাসে।

হে ভগবন্, সুখের স্বরূপ কি তাহাই আমি জানিতে চাই। আশ্চর্য্য প্রশ্ন! সুখ কি তাহা সকলেই বুঝে, নারদ কিন্তু, তাহা বুঝেন নাই। তাই গুরুর শরণ লইতেছেন।

এই প্রশ্নের উত্তরে সনৎকুমার বলিয়াছিলেন—যো বৈ ভূমা তৎসুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং, ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।"

যাহা ভূমা তাহাই সুখ অল্পে সুখ নাই; ভূমাই সুখ, সুতরাং ভূমাই জিজ্ঞাস্য।

নারদ বলিলেন—ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাসে।

ভগবন্, আমি সেই ভূমাকেই জানিতে চাহি।

উত্তরে যাহা সনৎকুমার বলিয়াছিলেন তাহা এই—

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি, সভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি অন্যদ্ বিজানাতি তদল্পং, যো বৈ ভূমা তদমৃতং অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্।

যাহাতে অন্য কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, অন্য কিছু শুনিতেও পাওয়া যায় না। (এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়) অন্য সকলের বিজ্ঞানও লুপ্ত হইয়া পড়ে, তাহাই ভূমা, আর যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায়, অন্য কিছু শুনা যায়, অন্য কোন বস্তুর বিশেষ জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাই অল্প। যাহা ভূমা তাহাই অমৃত, যাহা অল্প তাহাই বিনাশশীল। শ্রুতি-নির্দ্দিষ্ট এই ভূমা বা অমৃতলাভের পথ কি, এই জিজ্ঞাসাই

ভারতীয় সমস্ত অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মূল প্রেরণা। এই জিজ্ঞাসার চরিতার্থতার জন্য যে সাধন, তাহাই কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি নামে প্রথিত হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তি-হীন কেবল কর্ম্মের দ্বারা এই ভূমাকে পাওয়া যায় না। বহুকাল পূর্ব্বেই এই সিদ্ধান্ত অধ্যাত্ম শাস্ত্রসমূহে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাই তার স্বরে শ্রুতিও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—

প্লবা হ্যেতে-অদৃঢ়াযজ্ঞরূপাঃ।

এই ত্রিতাপ-সঙ্কুল ভব-সমুদ্রের পরপারে যাইবার জন্য যজ্ঞ বা বিহিত কর্ম্মরূপ যে প্লব (ভেলা), তাহা দৃঢ় নহে।

বাকী রহিল জ্ঞান ও ভক্তি। এই জ্ঞান ও ভক্তি মিলিতভাবে বা স্বতন্ত্রভাবে ভূমাকে পাইবার সাধন। ইহাই নির্ণয় করিবার জন্য ভারতের অধ্যাত্মবিদ্ মনীষিগণ যে যুগ-যুগান্ত ধরিয়া অপরিসীম সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিস্তৃতভাবে পরিচয় দেওয়া এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ঐ বিরাট যুগযুগান্তব্যাপী সাধনা অথবা তপস্যা কালভেদে, দেশভেদে, সম্প্রদায়ভেদে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিচয়ের বৈলক্ষণ্যে, নানা প্রদেশে নানা সম্প্রদায়ে নানা আকারে ফুটিয়া উঠিলেও সে সকলের জীবনস্বরূপ যে প্রেরণা বা মনোবৃত্তি-বিশেষ, তাহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া সেই উপনিষৎ প্রদর্শিত ভূমানন্দরূপ মহাসমুদ্রের দিকে প্রবলবেগবতী দুইটী স্রোতস্বিনীর ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ও অবিরাম গতিতে ছুটিতেছে। এই বিভিন্ন অথচ একই লক্ষ্যে প্রধাবিত নদীদ্বয়ের সঙ্গম ঘটাইবার অনুকূল যে ভাবধারা, এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, তাহাই ভারতের সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

বড়ই অল্প কথায় বিষয়টী বলা হইল। ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য আরও একটু বিস্তারের আবশ্যকতা আছে, এক্ষণে তাহাই করা যাইতেছে।

মানুষ চাহে সুখ, মানুষ চাহে না দুঃখ। তাই মানুষের যত প্রবৃত্তি, সে সকলের মূলে আছে সুখের ইচ্ছা বা রাগ, এবং দুঃখকে এড়াইবার ইচ্ছা বা দুঃখের প্রতি দ্বেষ। সুতরাং মানুষের প্রবৃত্তি দুইভাগে বিভক্ত হয়, এক রাগমূলক প্রবৃত্তি, দ্বিতীয় দ্বেষমূলক প্রবৃত্তি। এ সংসারে আমরা বুঝিয়া শুনিয়া যতপ্রকার কার্য্যে নিরত হই, সে সকল কার্য্যের মূলেই আছে—হয় আমাদের রাগমূলক প্রবৃত্তি, না হয় আমাদের দ্বেষমূলক প্রবৃত্তি। এই দ্বিবিধ প্রবৃত্তিকেই অধ্যাত্ম শাস্ত্রবিদ্‌গণ প্রেরণা বলিয়া থাকেন।

এ সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করার প্রথম ক্ষণ হইতে এ পর্য্যন্ত আমরা যত প্রকার সুখভোগ করিয়াছি, সেই সকল সুখের ভোগ অল্প, বা বিস্তরভাবে দুঃখের সহিত সম্বন্ধ—একথা সাধারণতঃ সকল মানুষই বুঝে। সুখভোগে দুঃখের সম্বন্ধ অপরিহার্য্য জানিয়াও আমরা সুখের জন্য নানা উপায়ের সংগ্রহে সর্ব্বদাই প্রবৃত্ত হইয়া থাকি, সকল কার্য্যেই দুঃখ সম্বন্ধ আছে জানিয়াও কর্ম্ম হইতে বিরত হই না। এই যে মানুষের স্বভাব বা অভ্যাস, ইহাকেই আমাদের দর্শন শাস্ত্রে লোকায়ত বলে। এই লোকায়ত স্বভাব বা অভ্যাস বশতঃ যে মতবাদ বা দর্শন মানব সভ্যতার প্রথম বিকাশ দিন হইতে এখনও চলিয়া আসিতেছে। এবং শুধু চলিয়া আসিতেছে তাহা নহে, এই যুগের দেহাত্মাভিমানরূপ দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার সর্ব্বতোমুখ প্রসারের সঙ্গে উত্তরোত্তর

বাড়িয়াই যাইতেছে। ইহাকেই অধ্যাত্মভাবপ্রবণ ভারতীয় সভ্যতার নেতৃবর্গ চার্ব্বাক বা লোকায়তিক দর্শন বলিয়া থাকেন। এই চার্ব্বাক দর্শনের আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন—

ত্যাজ্যং সুখং বিষয়সঙ্গমজন্ম পুংসাং
দুঃখোপসৃষ্টমিতি মূর্খবিচারণৈষা।
ব্রীহীন্ জিহাসতি সিতোত্তম তণ্ডুলাঢ্যান্
কো নাম ভো স্তুষকণোপহিতান্ হিতার্থী॥

ইষ্টবিষয়সমূহের সহিত চক্ষুঃ ও কর্ণপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন যে সুখ, তাহার সহিত দুঃখও মিলিত থাকে, এই কারণে সুখও হেয় এই প্রকার যে বিচার, তাহা মূর্খগণেরই হইয়া থাকে। বল দেখি যে ধান্যসমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট শুভ্রবর্ণ তণ্ডুল নিহিত আছে, তাহার বাহিরে তুষ আছে, ভিতরে কণা আছে, তাই বলিয়া কোন্ হিতার্থী নর সেই ধান্যরাশিকে পরিত্যাগ করিতে চাহে ?

যথা সম্ভব দুঃখকে হঠাইয়া অথবা যে সুখ লক্ষ্য, তাহা হইতে ঐ দুঃখ কম হইবে বুঝিয়া এ সংসারে সুখের জন্য কার্য্য করার এই প্রবৃত্তি যে সংসারী মানুষের পক্ষে অপরিহরণীয় হইলেও ভারতের অধ্যাত্ম শাস্ত্রসমূহে কিন্তু, ইহা সমর্থিত হয় না, কারণ এই প্রবৃত্তি ভারতীয় সভ্যতার নিদান বা মূলভিত্তি নহে। মূল কথা এই যে, বিনাশশীল দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্ম-বুদ্ধি ভারতীয় সভ্যতার মূলভিত্তি নহে। কিন্তু আমি বা আমার আত্মা যে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এবং তাহা দেহ, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির বিনাশে বিনষ্ট হয় না হইবার ও নহে এবং কোন রূপেই হইতে পারে না।

তাহা অজর, অমর এবং চিৎস্বরূপ। এইরূপ যে দৃষ্টি বা দৃঢ় নিশ্চয়, তাহারই উপর ভারতীয় সভ্যতা অনাদিকাল হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই আমি বা আমার আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন, এই নিশ্চয় যদি যথার্থভাবে হৃদয়ে দৃঢ় মূল হয়, তাহা হইলে মানব পূর্ব্বোক্ত লোকায়ত দৃষ্টিমাত্রেরই উপর নির্ভর করিয়া গতানুগতিকভাবে সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারে না।

দেহাদি হইতে আত্মা পৃথক্ এই নিশ্চয়ের পর এসংসারে সুখ ও দুঃখনিবৃত্তির জন্য লৌকিক কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি যখন শিথিল হইয়া পড়ে, তখন মৃত্যুর পর লোকান্তরে আত্মার সুখ যে সকল কার্য্যের উপর নির্ভর করে, তাহাই করিবার জন্য প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া দাঁড়ায় এবং সেই প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানব পারলৌকিক সুখের সাধন বলিয়া যে সকল কর্ম্মকে বুঝিয়া থাকে, তাহার অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক। শাস্ত্রবিহিত যাগ, হোম, দান ও জপ প্রভৃতিই এ পারলৌকিক সুখলাভের সাধন বলিয়া যখন বিশ্বাস হয়, তখন তাহাদেরই অনুষ্ঠানের আড়ম্বর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহাতেও মানবের আত্মা পরিতৃপ্তি বা শান্তি লাভ করে না, কারণ যুক্তি ও বিবেকের সাহায্যে সে বুঝিয়া থাকে যে, এই সংসারে পার্থিব সুখ লাভ করিতে যে সকল কার্য্য করা যায়, তাহার ফল যে সুখ, তাহা যেমন চিরস্থায়ী নহে, সেইরূপ পরলোকেও সুখের জন্য যাহা কিছু কার্য্য করা যাইতেছে, তাহার ফল যে প্রকার সুখই হউক না কেন তাহাও চিরস্থায়ী বা অবিনশ্বর হইতে পারে না। তাই শ্রুতিও স্পষ্ট বলিতেছেন—

তদ্ যথেহকর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এব মে বামুত্র পুণ্য চিতোলোকঃ ক্ষীয়তে।

এই পৃথিবীতে কার্য্যের দ্বারা উপার্জ্জিত ধনধান্যাদি ও তজ্জনিত সুখ যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেরূপ এই মানব দেহে পরলোকে সুখভোগের জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্মনিবহের ফলস্বরূপ যে স্বর্গাদিলোক, তাহাও বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

এই ভাবে পারলৌকিক বিনশ্বর স্বর্গাদি সুখেও যখন মানবের আসক্তি কমিয়া যায়, তখন তাহার অবিনাশী সুখের সন্ধান লাভের জন্য ব্যগ্রতা স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ব্যগ্রতা ও তজ্জনিত তীব্র জিজ্ঞাসা, যাহার জ্ঞানে মিটে তাহার স্বরূপ শ্রুতি—অর্থাৎ আমাদের আত্মার আত্মা আনন্দময় পরমাত্মার নিত্য সিদ্ধ বাণী জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়া দিতেছে, যাহা ভূমা তাহাই সুখ, যাহা অল্প বা পরিমিত তাহাতে সুখ নাই। সেই ভূমারই পরিচয় প্রসঙ্গে শ্রুতি আবার বলিতেছেন—

> ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতো হয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনু ভাতি সর্ব্বম্
> তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ মুণ্ডকোপনিষৎ॥

সূর্য্যের আলোকে তাহা প্রকাশিত হয় না—চন্দ্র বা তারকার স্নিগ্ধ কিরণেও তাহা প্রকাশ পায় না—বিদ্যুতের আলোক ছটায় তাহা স্ফুরিত হয় না—অগ্নির প্রকাশে তাহা প্রকাশিত হইবে এরূপ সম্ভাবনাও করা যায় না। অথচ তাহা অর্থাৎ ভূমা, নিজের প্রকাশেই সর্ব্বদা প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেই স্বয়ংপ্রকাশ ভূমারই প্রকাশে

এ সংসারে সকল বস্তু প্রকাশিত হয়। সেই স্বয়ং প্রকাশ এবং সর্ব্ব বস্তুর প্রকাশক ভূমারই নাম ব্রহ্ম। উপসংহারে শ্রুতি বলিতেছেন—

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥

মুণ্ডকোপনিষৎ॥

ইহাই ব্রহ্ম, ইহাই অমৃত, এই ব্রহ্মই তোমার পূর্ব্বভাগে, ইহাই তোমার পশ্চাদ্ভাগে, ইহাই তোমার দক্ষিণে, ইহাই তোমার উত্তরে, ইহাই তোমার নিম্নে এবং ইহাই তোমার মাথার উপরে, ইহাই সমগ্র বিশ্ব, সুতরাং ইহাই বরিষ্ঠ অর্থাৎ ভূমা। এই ব্রহ্মের-জ্ঞানে কি ফল হয়, তাহা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া শ্রুতি গাহিতেছে—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

মুণ্ডকোপনিষৎ॥

দ্রষ্টা জীব যখন এই ব্রহ্মকেই সকলের মূল কারণ বলিয়া বুঝিয়া থাকে, এবং এই ব্রহ্মকেই সুবর্ণ-বর্ণ, কর্ত্তা, ঈশ্বর ও একমাত্র পুরুষ বলিয়া বুঝিতে সমর্থ হয়, তখনই সে বিদ্যা লাভ করে। সেই বিদ্যারই প্রভাবে সে পুণ্য ও পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়, তাহার সকল ভ্রান্তিই বিদূরিত হয় এবং সে সেই সুবর্ণ-বর্ণ, কর্ত্তা, ঈশ্বর বা পরম পুরুষের সমতা লাভ করিতে সমর্থ হয়।

মুণ্ডক শ্রুতির উল্লিখিত মন্ত্রকয়টীতে যে ব্রহ্ম-তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা লইয়া

অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্ মনীষিগণের মধ্যে মতদ্বৈধের সৃষ্টি হইয়াছে। জ্ঞানবাদী মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, জীবের সহিত ব্রহ্মের আত্যন্তিক অভেদই হইল এই শ্রুতির বাস্তব অর্থ। ভক্তিবাদী মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, জীবের সহিত ব্রহ্মের আত্যন্তিক ভেদই এই মন্ত্র কয়টীর বাস্তব অর্থ। এই প্রকার মতভেদ ভারতের অধ্যাত্ম-জগতে যে সংশয় ও তন্মূলক নানাপ্রকার বাদবিবাদের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা এখানে আলোচ্য নহে।

এই দুইটী মতের মূলীভূত মানব-হৃদয়ের পূর্ব্বোক্ত স্বতঃসিদ্ধ প্রেরণাদ্বয়, অনাদিকাল হইতে বিভিন্ন পথে সেই ভূমানন্দরূপ সমুদ্রের দিকে কখনও দ্রুত, কখনও বা মৃদুগতিতে প্রবাহিত হইতেছিল। গঙ্গা ও যমুনার ন্যায় এই দুই মহানদীর সঙ্গম না হইলে সেই সমুদ্রের সহিত মিলন সম্ভবপর হয় না। এই মহামিলনের জন্য অধ্যাত্ম-ভারতের যে যুগযুগান্তব্যাপিনী তপস্যা, তাহারই নামান্তর বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

জ্ঞান ও ভাবের পরিচয়

অধ্যাত্মরাজ্যের বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা প্রধানতঃ জ্ঞানমুখী ও ভাবমুখী—এই দ্বিবিধ প্রেরণা বা প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া, এক শান্তিময় ও প্রসাদময় পূর্ণাবস্থা বা সমুৎকর্ষ লাভের জন্য অগ্রসর হইতেছে। জ্ঞান বা বিষয়প্রকাশ অগ্রে হয়, তাহার পর হয় ভাবের উদয়। জ্ঞান না হইলে কোন বিষয়ের উপর রাগ হয় না, দ্বেষ হয় না, উপেক্ষাও হয় না। রাগ, দ্বেষ বা উপেক্ষা এই ত্রিবিধ মনোবৃত্তি জ্ঞানেরই পরিণতি। কারণ জ্ঞান না হইলে ইহারা জন্মে না। জ্ঞান হইবার পরই ইহাদের মধ্যে কোন একটী

সমুদিত হইয়া হৃদয়ে যে নানা জাতীয় বৃত্তিনিচয়ের সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহাদিগকেই অধ্যাত্মবিদ্‌গণ ভাবরাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রমাণের সাহায্যে প্রমেয় বস্তুর স্ফুরণই জ্ঞান। এই জ্ঞান হইবার পর তাহার ফলস্বরূপ আমাদের যত প্রকার জ্ঞানভিন্ন মনোবৃত্তি হইয়া থাকে, সেই সকল মনোবৃত্তিকেই ভাব বলা যাইতে পারে।

জ্ঞানমুখী যে প্রেরণা বা প্রবৃত্তি, তাহারই প্রাধান্য যাঁহারা মানিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদিগকেই আমরা জ্ঞানবাদী অথবা তত্ত্ববিদ্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। অন্যদিকে যাঁহারা ভাবমুখী প্রবৃত্তি বা প্রেরণা দ্বারা পরিচালিত হইয়া জ্ঞানকে ভাবের অপেক্ষা নিম্নে স্থান দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ভাবপ্রবণ বা ভাবুক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। জ্ঞানপ্রবণ বা তত্ত্ববিদ্ মনীষিগণ ভাবরাজ্যকে একেবারে উপেক্ষা না করিলেও তাহা যে জ্ঞানের তুল্য কক্ষ নহে, একথা স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অন্যদিকে ভাবপ্রবণ মনীষিগণ জ্ঞানকেও একেবারে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, তাহাকে ভাবের অনুগত বা অঙ্গ সুতরাং অপ্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেবল জ্ঞান বা ভাবের প্রতি আগ্রহাধিক্য মানবের পূর্ণতা বিধানের অনুকূল নহে, প্রত্যুত প্রতিকূলই হইয়া থাকে এবং তাহারই পরিণাম হইয়া থাকে অধ্যাত্ম-রাজ্যে মতভেদ-বাহুল্য ও তন্মূলক নানাপ্রকার বিরোধের সৃষ্টি।

জ্ঞানপ্রবণ প্রবৃত্তির প্রাবল্য ঘটিলে মানব সংসারকে একেবারেই তুচ্ছ বোধ করে। সংসারের সহিত সকল প্রকার সম্বন্ধই তাহার বিরক্তিকর হইয়া উঠে। যে সকল

প্রমাণ ও যুক্তি সংসারকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহে, তাহাদেরই অনুশীলনের প্রভাবে, স্বপ্নকল্পিত বস্তু হইতে এ সংসারের বস্তুতঃ কোন প্রকার পার্থক্য নাই—সুতরাং ইহা একেবারেই মিথ্যা, এই প্রকার বিশ্বাসও ক্রমশঃ তাহার হৃদয়ে দৃঢ় হয়। একমাত্র পরমার্থ সদ্‌বস্তু যে জ্ঞান বা প্রকাশ, তাহাই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া থাকে। সেই অখণ্ড সর্ব্বভেদবিবর্জ্জিত সর্ব্বোপাদান অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্বকে জানিয়া, প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহাতেই মিশিয়া যাইবার জন্য সে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে। এমন কি, সেই জ্ঞানের পরিণাম যদি তাহার অহংভাবের বিনাশও হয়, তাহাও তাহার স্পৃহণীয় হইয়া থাকে, এই জ্ঞানমুখী প্রবৃত্তির প্রাবল্য বৌদ্ধ যুগের ভারতে যে তীব্র বৈরাগ্যময় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে পাওয়া যায় না। ভারতে নবোদিত বৌদ্ধ যুগে বুদ্ধ ধর্ম্মও সঙ্ঘ সংক্রান্ত বিচিত্র ঘটনাবলিই ইহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন।

পরলোকে নিরবধি ও নিরন্তর সুখভোগের আশায় শাস্ত্রবিধানানুসারে অগণিত পশুবধ করিয়া এবং দীর্ঘকাল প্রজ্বলিত অগ্নিতে নানাবিধ আহুতি দিয়া যজ্ঞীয় হবির ধূমে দিঙ্‌মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া, যখন আস্তিক মানব বুঝিতে পারিল, "যৎকৃতকং তদনিত্যং" যাহা মানুষের কৃতিদ্বারা সম্পাদিত, তাহা বিনশ্বর, সুতরাং স্বর্গসুখের জন্য পরকে দুঃখ দিয়া, অজস্র অর্থব্যয় এবং জীবনব্যাপী আয়াস স্বীকার করিয়া, অবশেষে যদি আকুল হৃদয়ে—অতৃপ্ত বাসনা সমষ্টির গুরুভার ভগ্নমনে বহন করিতে করিতে সর্ব্বসংহারক অথচ অপরিহার্য্য মৃত্যুর অতল অন্ধকারময়

গহ্বরে পতিত হইতে হয়, তবে তাহার মানব-জন্ম-লাভের বিশেষ সার্থকতা কি? এই জাতীয় ভোগাকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি-জনিত প্রতিক্রিয়া যখন শ্রৌতকর্ম্মপ্রধান যুগের ভারতে দুর্জ্জয়রূপে আত্মবিকাশ করিয়াছিল, তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নবীন অভ্যুদয়ে শ্রৌত-যাগাদিতে ভারতের বিশ্বাস দুর্ব্বল ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল নিজের প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমানের উপরই নির্ভর করিয়া নিঃশ্রেয়স বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকে নিজেই করিয়া লইতে হইবে—এই প্রকার যে জ্ঞানমুখী প্রবৃত্তি, তাহা দ্বারা পরিচালিত হইয়া নির্ব্বাণের অনুসন্ধানার্থ ভারতের মুমুক্ষু মনীষিবৃন্দ এক নূতন সাধন পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহারই পরিণাম ক্ষণভঙ্গবাদ, দুঃখবাদ ও শূন্যবাদ। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত "সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং, দুঃখং দুঃখং, শূন্যং শূন্যং" সকলই ক্ষণিক-ক্ষণিক, সকলই দুঃখ-দুঃখ, সকলই শূন্য-শূন্য—এই ক্ষণভঙ্গবাদ, দুঃখবাদ, ও শূন্যবাদের আবেশে আচ্ছন্নমতি সাধকের নিজ অস্তিত্বপর্য্যন্তও যেন শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। আমি থাকিব না অথচ আমি মোক্ষলাভ করিব—এই পরস্পরবিরোধী ভাবদ্বয়ের সমন্বয় করিবার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের দার্শনিক গবেষণা ও কঠোর সাধনার পরিণাম হইল অগণিত সংঘারাম ও বিহারে সংসারবিমুখ লক্ষ লক্ষ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর আশ্রয় গ্রহণ। পরে এই সকল মতবাদের ভস্মস্তূপের উপর বোধিসত্ত্ববাদ আবির্ভূত হইল, জ্ঞানমুখী ও ভাবমুখী প্রেরণার সমন্বয়ের জন্য এই বোধিসত্ত্ববাদ উত্থিত হয়, ইহা যে আত্মত্যাগের, সর্ব্বভূতকরুণার ও বিশ্বমৈত্রীর ত্রিবেণীসঙ্গম সৃষ্টি

করিয়াছিল, পৃথিবীর আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসে তাহা অতুলনীয়। কিন্তু এই অপূর্ব্ব ত্রিবেণীসঙ্গম সর্ব্বশূন্য-বাদের উপর প্রবাহিত হইতেছিল বলিয়া, ভারতের শ্রৌতভাবাপন্ন মনীষিগণের মনোরাজ্যে ইহা শ্রদ্ধেয় হইতে পারে নাই। সুতরাং ইহার প্রতিক্রিয়া ক্রমেই প্রবল হইতে আরম্ভ করিল। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই উপনিষদের প্রতিপাদ্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভূমার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া অমৃতত্ব লাভের অদম্য প্রেরণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জ্ঞানমুখী প্রবৃত্তি আবার প্রবল হইয়া উঠিল, ফলে ভাবমুখী প্রবৃত্তির বেগ মন্দীভূত হইয়া পড়িল।

আচার্য্য গৌড়পাদ, গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ এবং ভগবৎপাদ আচার্য্যশঙ্করপ্রমুখ ব্রহ্মাদ্বয়বাদরূপ দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠাপক এবং তাঁহাদের অনুযায়ী পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, বাচস্পতিমিশ্রপ্রমুখ অগণিত দার্শনিক আচার্য্যগণ, যে অদ্বয় ব্রহ্মবাদের প্রচার করিলেন তাহার ফলে শূন্যবাদমূলক বোধিসত্ত্ববাদ ভারতের অধ্যাত্ম ভাবরাজ্যের বিশাল ক্ষেত্র হইতে উৎসারিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল ; অদ্বয়ব্রহ্মবাদের সিদ্ধান্তসমূহই ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এই শ্রুতিমূলক ব্রহ্মাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠায় ভারতের কেবল ভাবমুখী প্রেরণা কিছুকালের জন্য ক্ষীণ ও ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু,মরুদেশ সঞ্চারিণী সরস্বতী নদীর ন্যায় তাহা একেবারে বিলীন হয় নাই। সর্ব্বাত্মভূত অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের শুষ্ক মরুতে পড়িয়া, ইহার প্রখর গতি মন্দীভূত হইয়াছিল

মাত্র। কিন্তু "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দীভবতি কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদ্যেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।" সেই ভূমাই রস, জীব রসকেই লাভ করিয়া আনন্দময় হয়, এ সংসারে কে চলা ফিরা করিত, কেই বা বাঁচিত; যদি এই আবরণশূন্য আনন্দরূপ আকাশ না থাকিত।

এই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য রসরূপ ভূমার আস্বাদনের জন্য ধাবমান ভাবমুখী প্রবৃত্তি স্রোতস্বিনীর গতি কিছুকালের জন্য মন্দীভূত হইয়াছিল মাত্র, আবার তাহা দার্শনিক জ্ঞানরাজ্যের সীমার বাহিরে আসিয়া কাল্পনিক সুখময় এক নবাবিষ্কৃত ভাবরাজ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং কয়েক শতাব্দীর জন্য দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হইতেও আরম্ভ করিয়াছিল।

এই নূতন ভাবমুখী ভারতীয় আত্মার প্রেরণারূপ স্রোতস্বিনীর যে নবাবিষ্কৃত পন্থা বা খাত, তাহার প্রথম উদ্ভাবয়িতার নাম নাট্যসূত্রকার ভরত-মুনি। অগ্রগামী ভগীরথের শঙ্খধ্বনির অনুসরণকারিণী গঙ্গার ন্যায় ভরত মুনির শঙ্খধ্বনিকল্প নাট্য সূত্রের অনুসরণকারিণী ভারতের এই ভাবমুখী প্রবৃত্তিরূপ স্রোতস্বিনী ক্রমেই খরতর গতিতে সেই ভূমানন্দরূপরস সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

অদ্বয় ব্রহ্মবাদীর একান্ত উপেক্ষিত প্রপঞ্চের মধ্যে অনাদিকাল হইতে প্রবিষ্ট জীব—তাহার ভোগ্য নদী, নির্ঝর, তরুলতা, গিরি, প্রান্তর, নীলাকাশ, শারদ পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোৎস্না-সার, কোকিল কলকাকলী, মধুকর গুঞ্জন, মল্লিকা, মালতী, যূথিকা ও শতদল প্রভৃতি কুসুমের সৌরভ, মন্দ মন্দ মলয়ানিল প্রভৃতি বস্তুকে কবি কল্পনার তুলিকায় নূতন করিয়া চিত্রিত

করিয়া, তাহারই সাহায্যে মানুষের প্রসুপ্ত মধুর ভাব নিচয়কে জাগাইয়া নূতন আকারে সমুজ্জীবিত করিয়া তুলিল। বাহিরের দুঃখময় প্রাপঞ্চিক সত্তা হইতে এই সকল বস্তুকে পৃথক্ করিয়া স্বপ্রকাশ আনন্দময় রসরূপে স্বানুভূতির বিষয় করিয়া, মানবের আজন্মসিদ্ধ সহজ ভাবপ্রবণতার চরিতার্থতা বিধানই হইল এই ভরত প্রণীত নাট্য সূত্রের মূল লক্ষ্য, এই নাট্য সূত্রের মৌলিক ভাবে বিভোর হইয়া, আত্মহারা হইয়া প্রাকৃত আত্মা ও তাহার ভোগ্য নিচয়কে কাল্পনিক ভাবে—সচেতন করিয়া—বহির্বিমুখ চেতনার সত্তায় পরিণত করিয়া, আস্বাদন করিবার ও করাইবার জন্য ভারতীয় রস-শাস্ত্রের আচার্য্যগণ যে নূতন কাব্যরূপ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা যেমন মধুর, তেমনি সুন্দর, এবং তেমনিই অতুলনীয়। ভারতের অলঙ্কার শাস্ত্রের রহস্যবিদ্ সহৃদয় মনীষিগণের নিকট এ তথ্য সুবিদিত, সুতরাং এক্ষেত্রে তাহার নূতন করিয়া পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক।

বৌদ্ধ ভাবের অবনতির সঙ্গে—পরস্পরনিরপেক্ষ এই জ্ঞানপ্রবণপ্রবৃত্তি ও ভাবপ্রবণপ্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠার যুগের আরম্ভ। খ্রীষ্টিয়শতাব্দীর আরম্ভ হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত—এই যুগের স্থিতি, এযুগেও কিন্তু, মানুষের অন্তর্নিহিত ভূমানন্দের অনুভূতির জন্য তীব্র আকাঙ্খা তৃপ্ত হইতে পারে নাই। প্রাকৃত নরনারীর কবিকল্পনার সাহায্যে নূতন সৃষ্টি করিয়া রস, রসাভাস, ভাব, ভাবাভাস, ভাবোদয়, ভাবসন্ধিও, ভাবশবলতার বিচিত্র আবর্ত্তময় এবং উত্তেজনা-তরঙ্গ সঙ্কুল মানসসমুদ্রে অবগাহন করিয়া ব্রহ্মাস্বাদসহোদর প্রাকৃত রসরূপ আনন্দে রসানুভূতিতে ভারতের অন্তরাত্মা

এযুগে যেমন পরিতৃপ্ত হইতে পারে নাই, তেমনই নেতি নেতি করিতে করিতে স্থূল, সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত এই তিন ভাগে বিভক্ত নিখিল প্রপঞ্চের সত্তাকে উড়াইয়া দিয়া অশব্দ-অস্পর্শ-অরূপ-অব্যয় অদ্বিতীয় ও বাঙ্মনসাতীত চৈতন্য রূপ অগাধ সমুদ্রে নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের বিলোপ সাধনও কিন্তু, সকলের স্পৃহণীয় বলিয়া প্রতীত হইতে পারে নাই। তাৎকালিক ভারতের মহাদার্শনিক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক আনন্দ বর্দ্ধনাচার্য্যের স্বকৃত একটী শ্লোকে ভারতীয় আত্মার এই অবিতৃপ্তির চিত্র বড়ই বিশদভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ ধ্বন্যালোকের শেষভাগে তাঁহার সেই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

"যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং দৃষ্টিঃ কবীনাং নবা
দৃষ্টির্যা পরমার্থবস্তুবিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।
তে দ্বে অপ্যলম্ব্য বিশ্বমখিলং নির্বর্ণয়ন্তো বয়ম্
শ্রান্তা নৈব তু লব্ধমব্ধিশয়নত্বদ্‌ভক্তিতুল্যং সুখম্॥"

নয় প্রকার রসের আস্বাদন করিবার ও করাইবার জন্য ব্যাপৃত যে নূতন কবিদৃষ্টি এবং পরমার্থ বস্তু প্রকাশন সমর্থ যে বৈপশ্চিতী বা দার্শনিক দৃষ্টি, এই দুইটী দৃষ্টিরই সাহায্যে আমরা অখিল বিশ্বকে বুঝিয়াছি এবং বুঝিয়া তাহার স্বরূপ কি, তাহা বর্ণনও করিয়াছি, অবশেষে এই রূপে আজীবন বিশ্বদর্শন ও বিশ্ববর্ণন করিতে করিতে আজ আমরা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি কিন্তু, হে জলধিশায়িন্ ভগবন্, তোমাকে ভালবাসা রূপ যে ভক্তি, তাহার ন্যায় সুখ এখনও আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

সকল সুন্দরের সুন্দর, সকল মনোহরের মনোহর, সর্ব্ব মাধুর্য্যের সার, সর্ব্ব লাবণ্যের পার, আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ ও জীবনের জীবন সেই উপনিষৎ প্রতিপাদ্য ভূমাকে শুনিয়া, মনন করিয়া, বুঝিয়া এবং দেখিয়া তাহাতেই মজিয়া, তাহাতেই সর্ব্বস্ব বিলাইয়া তাহারই জন্য বাঁচিয়া থাকাই ভক্তি, তাহারই নাম প্রেম। এই বিশ্বজনীন প্রেমই মানব জীবনের চরম বা পরম পুরুষার্থ, এই পরম পুরুষার্থ লাভের জন্য মানবের আজীবন সঙ্গিনী যে অতৃপ্তি ও আকাঙ্খা, আনন্দ বর্দ্ধনাচার্য্যের উল্লিখিত কবিতাতে তাহাই বড়ই সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, অতৃপ্তি, সুখানুভূতি ও আকাংক্ষাই শ্রৌত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মৌলিক উপাদান।

বৈষ্ণব সাধনার অন্তর্নিবিষ্ট কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি (সাধন ভক্তি) এই অতৃপ্তি, সুখানুভূতি ও আকাঙ্ক্ষার অভিব্যঞ্জন বা সাধনাবস্থা।

এই অতৃপ্তিময় আস্বাদময় আকাঙ্খার বিষয় ভূমাকেই দেখিবার জন্য দেখিয়া, তাহারই মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার জন্য, প্রবিষ্ট হইয়া জীবে জীবে অবস্থিত সেই ভূমারই প্রাণ ভরিয়া সেবা করিবার জন্য ভারতীয় আত্মার যে আকুল আকাঙ্ক্ষা, তাহাই ঋগ্‌বেদ সংহিতার বিষ্ণু সূক্তে আমরা সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাই—যথা—

"ত্বং বিষ্ণো সুমতিং বিশ্বজন্যা" মিত্যাদি

বিশ্ব প্রাণীকে সুখী করিবার জন্য শ্রীভগবানের নিকট সাধন সামগ্রীর এই প্রার্থনা। বৈষ্ণব-ভাবের অন্তর্নিহিত বিশ্বজনীন প্রীতিরই অভিব্যক্তি। জ্ঞানমুখী প্রেরণা ও ভাবমুখী প্রেরণার সমন্বয় না হইলে অর্থাৎ স্বীয় সত্তার স্বাতন্ত্র্য

রক্ষার সহিত এই দ্বিবিধ প্রেরণার পরস্পরের উন্নতির জন্য পরস্পরের আনুকূল্য না ঘটিলে—মানব জীবনের পূর্ণতা বা চরিতার্থতা সম্ভবপর হয় না, এই চরিতার্থতা লাভের অসাধারণ যে সাধন, তাহাই হইল ভারতের বৈষ্ণবধর্ম্ম। বেদসংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, ধর্ম্মসূত্র, ধর্ম্মসংহিতা, ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতি সমগ্র আর্যগ্রন্থেই এই সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ—কখনও সূক্ষ্ম ভাবে কখনও বা ব্যক্তভাবে, অবিরাম গতিতে সেই ভূমানন্দ রস-রূপ মহাসমুদ্রের দিকে ধাবিত হইতেছে, ভারতীয় সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুশীলনকারীর পক্ষে এই অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। ইহার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ববুভুৎসা বিড়ম্বনা মাত্র।

সংহিতা ও উপনিষদের যুগ হইতে খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই শ্রুতিমূলক বিশ্বজনীন সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের বাহিরের আকার, আচার ও ব্যবহার যে কত পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত আলোচনা এক্ষেত্রে সম্ভব পর নহে এবং আবশ্যক বলিয়াও মনে করি না। মালা, তিলক, তপ্তমুদ্রা, একাদশীব্রতব্যবস্থা, আহার্য্যবস্তুবিবেক, তীর্থমধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার, দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু, সন্ন্যাস, গার্হস্থ্য ও সাধক সাধিকার সম্বন্ধপ্রভৃতি বিষয় লইয়া, কত প্রকার বিচিত্র মতভেদ, কত বিবাদ, কত ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান এই বৈষ্ণব ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আত্মবিকাশ করিয়াছে, কিছুকালের জন্য বিস্তার পাইয়াছে এবং নিয়তি বশতঃ লুপ্ত হইয়া মহাবিস্মৃতির অতলস্পর্শ সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার অনুশীলন বা ঐতিহাসিক গবেষণাও এই

গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমসাময়িক যোগ্যতর প্রত্নতাত্ত্বিক বিদ্বন্মণ্ডলীর এই বিষয়ে রচিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত গ্রন্থনিবহে উহা অনুশীলিত হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ তাহা অল্পায়াসেই দেখিয়া লইতে পারিবেন।

একই উপাস্য দেবতার নাম ও মূর্ত্তি লইয়া বৈষ্ণবগণের মধ্যে কত বিভিন্ন সম্প্রদায় দাঁড়াইয়াছে। তাহা পৌরাণিক অবতারবাদের আবির্ভাবের সময় হইতেই দেখা দিয়াছে অথবা পুরাণে ও তন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে, ইহার নির্ণয় হওয়া কঠিন; বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য এক বিষ্ণুরই নাম ও মূর্ত্তি যে কত, তাহার বিস্তৃত তালিকাও এখানে দেওয়া আবশ্যক মনে হয় না। মহাভারতের মধ্যে দেখিতে পাই, বৈষ্ণবের উপাস্য দেবতার নাম নারায়ণ। নারায়ণ চতুর্ভুজ, তাহাঁর চারি হাতে আছে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, কিন্তু এই শঙ্খ, চক্র গদা ও পদ্মের মধ্যে কোনটী কোন্ হাতে আছে তাহার নির্ণয় করিতে যাইয়াই যত গোলযোগ। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে উহা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত; শুধু তাহাই নহে উহাদের বাম হস্তে বা দক্ষিণ হস্তে, ঊর্দ্ধ বা অধোভাগে অবস্থিতির ভেদ বশতঃ একই নারায়ণের উপাসক ভেদে নামের রূপের ও উপাসনা বিধির বহু পার্থক্য হইয়া পড়িয়াছে। যেমন কেশব, জনার্দ্দন, ত্রিবিক্রম, দামোদর ইত্যাদি।

শ্রীভগবান্ নারায়ণের মূর্ত্তির প্রকারভেদের ত এই অবস্থা। ইহার সঙ্গে আছে তাঁহার অবতারসমূহের ও শ্রীবিগ্রহের প্রকার ভেদ। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে অসংখ্য ভগবদবতারের মধ্যে

প্রধানতঃ দশাবতারের প্রত্যেক মূর্ত্তিই উপাসিত হইয়া থাকে, যথা মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। এই সকল অবতারের মূর্ত্তির ধ্যান বিভিন্ন পুরাণে ও তন্ত্রে নানাপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণ ও তন্ত্রলিখিত ধ্যানানুযায়িনী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া বৈষ্ণব উপাসকগণ পূজা করিয়া থাকেন, তদনুসারে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বহু সম্প্রদায়ও প্রচলিত আছে। সে সকলের বিস্তৃত পরিচয়ও এস্থলে অনাবশ্যক; প্রাসঙ্গিকভাবে এই বিষয়ের উল্লেখ করা হইল মাত্র।

এই প্রকার সম্প্রদায়ভেদে বহুমুখী ও ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা বা সাধনাপ্রণালী বৈষ্ণব ধর্ম্মের বাহিরের রূপ মাত্র। কিন্তু, ইঁহার আভ্যন্তর ও সনাতন যে রূপ, তাহা অতি প্রাচীন কাল হইতে এপর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিতই আছে। তাহা প্রত্যেক মানবের আজন্মসিদ্ধ ও আমরণ স্থায়ী। তাহা জ্ঞানপ্রবণ ও ভাবপ্রবণ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিদ্বয়ের পরস্পর আনুকূল্য সম্পাদন দ্বারা পরিপূর্ণ মানবত্ব প্রাপ্তির জন্য অবিশ্রান্ত প্রবাহময়ী আত্মপ্রেরণা। তাহারই ক্রমবিকাশের যাহা ইতিহাস, তাহারই অপর নাম ভারতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্র।

জ্ঞানমুখী ও ভাবমুখী এই দ্বিবিধ প্রেরণার সমন্বয় বিধানের জন্য ভারতের অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মধ্যে যত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মহর্ষি বেদব্যাসের দুইখানি গ্রন্থ অর্থাৎ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও শ্রীমদ্‌ভাগবতই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রধানতম এবং নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় আঠারটী অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত ভাবে যাহা কথিত হইয়াছে, দ্বাদশ স্কন্ধে প্রবিভক্ত

অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক শ্রীমদ্ভাগবতেও তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত ও দার্শনিকভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ গ্রন্থ শ্রীমদ্-ভাগবতে সূত্র স্থানীয় একটী শ্লোকেই মানবের জ্ঞেয় পরমার্থ তত্ত্বের স্বরূপ এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে" ॥

ভাগবত, প্রথম স্কন্ধ।

তত্ত্ববিদ্‌গণ যে অদ্বয় জ্ঞানকে বাস্তব তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, তাহাই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিন প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

স্বয়ংপ্রকাশ অদ্বয় জ্ঞানই যে বাস্তববেদ্য, তাহাতে তত্ত্ববিদ্‌গণের সকলেরই ঐকমত্য আছে কিন্তু, তাহা এক হইয়াও সাধকের দৃষ্টিভেদবশতঃ কখনও ব্রহ্মরূপে, কখনও পরমাত্মরূপে, কখনও বা ভগবান্‌রূপে অভিহিত হইয়া থাকে—এই যে আর্ষ সিদ্ধান্ত, তাহা এমন সরল ভাষায়, এমন সুস্পষ্টরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও আর্ষ গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

ভাবনিরপেক্ষ জ্ঞানপ্রবণ মানর মনোবৃত্তির চরমোৎকর্ষ দশায় যে তত্ত্ব নামরূপাতীত নিরস্তভেদ এক অদ্বিতীয় ও স্বয়ং প্রকাশ চৈতন্যরূপে স্ফুরিত হয়, তাহাই ব্রহ্ম শব্দের একমাত্র প্রতিপাদ্য,—ইহাই হইল ভারতীয় অদ্বৈতবাদের চরম সিদ্ধান্ত, অন্যদিকে জ্ঞানসাপেক্ষ ভাবপ্রবণ মানব মনোবৃত্তির চরমোৎকর্ষদশায় সে তত্ত্ব জীবমাত্রের অন্তর্য্যামী ব

পরমাত্মরূপে স্ফুরিত হয়, তাহাই জীবের একমাত্র ধ্যেয় ও জ্ঞেয়, তাহারই ধ্যানে ও জ্ঞানে সর্ব্বপুরুষার্থের সিদ্ধি হইয়া থাকে—ইহাই হইল ভারতীয় যোগশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত; অন্যদিকে সমপ্রাধান্যযুক্ত অথচ পরস্পর অনুকূল জ্ঞানের ও ভাবের চরমোৎকর্ষ দশায় যে অদ্বয়তত্ত্ব স্বতঃ স্ফুরিত হয়, সেই বাস্তব বেদ্যই, শ্রীভগবান্ এই শব্দের দ্বারা সকল অধ্যাত্ম শাস্ত্রে অভিহিত হয়, ইহাই হইল ভারতীয় ভক্তি-শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত, ইহাই এই শ্লোকটীর দ্বারা সূত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়া, দ্বাদশস্কন্ধে প্রবিভক্ত বিশালভাগবত গ্রন্থে মহর্ষি বেদব্যাস ভাল করিয়া বুঝাইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও অর্জ্জুনোপদেশব্যপদেশে এই অদ্বয়তত্ত্বের এইরূপ ব্যাখ্যা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং করিয়াছেন। গীতায় পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তদশাধ্যায়ে যে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব নানাপ্রকারে উপদিষ্ট হইয়াছে, শেষ অষ্টাদশ অধ্যায়ে তাহারই উপসংহার করা হইয়াছে, ইহা সকল গীতা ব্যাখ্যাতাই স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই উপসংহারে ভগবান্ বলিতেছেন—

"অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃশান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে"॥

অহঙ্কার, বল, দর্প, ভোগাভিলাষ, ক্রোধ ও আসক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া, প্রপঞ্চের যাবদ্ বিষয়েই 'আমার ইহা', এই প্রকার বুদ্ধি পরিত্যাগ করিলে মানব শান্ত হয়। তখনই সে ব্রহ্মভাবকে পাইবার যোগ্যতা লাভ করে।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃসর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্"॥

এই প্রকার ব্রহ্মভাবকে পাইলে মন সর্ব্বদা প্রসন্ন হইয়া থাকে, তখন কোন বস্তুর বিয়োগে তাহার শোক হয় না, কোন অপ্রাপ্ত বস্তুকে লাভ করিতে অভিলাষও হয় না, সকল প্রাণীর প্রতি তাহার সমতা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইবার পর তাহার পরা ভক্তির উদয় হয়।

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" ॥

সেই পরাভক্তির দ্বারাই আমি কে তাহা এবং আমার মহিমাই বা কি তাহাও সে যথার্থরূপে বুঝিতে পারে, এইরূপে আমাকে বুঝিয়া সে তদনন্তর আমাতেই প্রবেশ করিয়া থাকে—গীতায় উপসংহারে এই তিনটি শ্লোকের অর্থ লইয়া দার্শনিকগণের মধ্যে বিলক্ষণ মত ভেদ প্রকাশ পাইয়াছে, সে সকল কথা তুলিয়াও মীমাংসার জন্য আড়ম্বর করিয়া গ্রন্থ শরীর বাড়াইতে আমার প্রবৃত্তিও নাই, সাহসও নাই। মুক্তিবাদী বা জীবন্মুক্তিবাদী দার্শনিকগণকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে এই প্রসঙ্গে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাই এক্ষণে উদ্ধৃত করিয়া আমি প্রকৃতের দিকে অগ্রসর হওয়াকে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি—

শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তিটী এই :—
"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ"।

হে পদ্মনেত্র ভগবন্‌, এ সংসারে অনেক লোক এমন আছে, যাহারা অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন করিতে করিতে এমন এক মানসিক অবস্থায় উপনীত হয়, যখন তাহারা আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত বলিয়া মানিয়া থাকে, কিন্তু তোমাতে তাহাদের ভক্তি না থাকায়, তাহাদের বুদ্ধি তখনও বিশুদ্ধতাকে লাভ করিতে পারে না, এই কারণে, তাহারা অতিশয় ক্লেশে উচ্চ পদে আরোহণ করিয়াও আবার সংসারে পতিত হইয়া থাকে, তাহাদের এই শোচনীয় পতনের কারণ এই যে তাহারা তোমার চরণে বিশ্বাসের সহিত আদর বা অনুরাগ, স্থাপন করিতে পারে নাই।

ইহার পর আরও পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্তএব
জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্‌।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি
র্যৈস্তৈঃ প্রায়শো ঽজিত জিতোঽসি ননু ত্রিলোক্যাম্‌॥"

যাহারা জ্ঞানলাভের জন্য প্রয়াস পরিত্যাগ করে এবং সকল অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া, সাধুজনকর্ত্তৃক গীয়মান শ্রুতিসম্মত তোমার গুণ ও লীলা প্রভৃতির বার্ত্তাকেই কায়মনোবাক্যে নত হইয়া জীবনরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে এবং নিজের ভূমিতেই অবস্থান করে, হে ভগবন্‌, এসংসারে তুমি অজিত হইলেও, তাহারাই তোমাকে জয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

কেবল জ্ঞানপ্রবণ প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানুষ তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে না, কিন্তু মানুষ যদি নিজের ভূমিতে অর্থাৎ জ্ঞান ও ভাবের সমন্বয়প্রভাবে সমুদিত বিশুদ্ধ

প্রেমেরই উপর নির্ভর করিয়া থাকে, এবং দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতিতে মিথ্যা অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্র সকল দিকে প্রকাশমান সেই সর্ব্বাত্মভূত সর্ব্বসুন্দর করুণাময় শ্রীভগবানেরই আনন্দময় সত্তার বিকাশ বুঝিয়া তৃণের ন্যায় নত হইয়া থাকে ও সাধুজনগীত শ্রীভগবানের গুণলীলাবার্ত্তা শুনিতে শুনিতে তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করে, তাহারাই সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়। উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক দুইটীতে এই সর্ব্বসিদ্ধান্তসার বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সূত্ররূপে সূচিত হইয়াছে।

ইহাই হইল শ্রুতিপাদিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম, ইহাই ভগবদ্গীতাও ব্রহ্মসূত্রের সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্তই যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে বিস্তারিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। গীতা হইতে যে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহারই অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্লোকটী এইরূপ—

"সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥"

সদা আমার শরণাগত হইয়া যে সকল প্রকার কর্ম্মই করিয়া থাকে, সে আমরাই অনুগ্রহে অপরিণামী নিত্যপদকে প্রাপ্ত হয়। এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে "সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি" অর্থাৎ সকল কর্ম্মই—তাহা শাস্ত্র বিহিতই হউক অথবা শাস্ত্র প্রতি-সিদ্ধই হউক, আচার্য্য শঙ্কর এবং মধুসূদন সরস্বতী, ইহাঁরা উভয়েই সর্ব্বকর্ম্ম শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন এবং তাৎপর্য্য বুঝাইতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই, "স ভগবদ্ভক্তিযোগোঽধুনা স্তূয়তে শাস্ত্রার্থোপসংহারপ্রকরণে শাস্ত্রার্থনিশ্চয়দার্ঢ্যায়, সর্ব্ব কর্ম্মাণি প্রতিষিদ্ধান্যপি, সদা

কুর্ব্বাণঃ অনুতিষ্ঠন্ মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ অহং বাসুদেব ঈশ্বরো ব্যপাশ্রয়ো যস্য সঃ। ময্যর্পিতসর্ব্বাত্মস্বভাব ইত্যর্থঃ, সোঽপি মৎপ্রসাদান্মমেশ্বরস্যপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং নিত্যং বৈষ্ণবং পদমব্যয়ম্॥" (গীতা শঙ্করভাষ্য)।

ইহার অর্থ এই—শাস্ত্রার্থের উপসংহার প্রকরণে শাস্ত্রার্থে দৃঢ়নিশ্চয় উৎপাদন করিবার জন্য, এখন সেই ভক্তিযোগের স্তুতি (শ্রীভগবান্ বাসুদেব) করিতেছেন "সর্ব্ব কর্ম্মাণি" ইত্যাদি উক্তিদ্বারা। সর্ব্ব কর্ম্ম (অর্থাৎ হউক না কেন তাহা প্রতিষিদ্ধ) তাহা ও যদি সর্ব্বদাই করিতে থাকে (কিন্তু) মদ্ব্যপাশ্রয় অর্থাৎ আমি বাসুদেব ঈশ্বর, আমিই ব্যপাশ্রয় (শরণ) যাহার, এইরূপ হইয়া অর্থাৎ আমাতেই "সর্ব্বাত্মস্বভাব অর্পণ করিয়া (যে এইরূপ করিতে পারে) সেও মৎপ্রসাদাৎ অর্থাৎ আমার—ঈশ্বরের প্রসাদে (অনুগ্রহে) পাইয়া থাকে। (কি পাইয়া থাকে?) "শাশ্বত" নিত্য এবং অব্যয় (অপরিণামী) বৈষ্ণবপদই পাইয়া থাকে। পরম জ্ঞানী সুতরাং পরম ভক্ত শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী স্বামী আচার্য্য শঙ্কর ভগবৎপাদের ভাষ্যানুসরণ করিয়া, শেষে, শাশ্বত বৈষ্ণব পদ যে অব্যয় অর্থাৎ অপরিণামী তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং আরও বলিয়াছেন "এতাদৃশো ভগবদেকশরণঃ করোত্যেব, ন প্রতিষিদ্ধানি কর্ম্মাণি, যদি কুর্য্যাৎ, তথাপি মৎপ্রসাদাৎ প্রত্যবায়ানুৎপত্ত্যা বিজ্ঞানেন মোক্ষভাগ্ ভবতীতি॥"

যে এতাদৃশ ভগবদেক শরণ, সে নিশ্চয়ই প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম করে না, যদি করে, তাহা হইলেও আমার অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রসাদে কোন প্রত্যবায় হয় না বলিয়া, আমাকে বিশেষভাবে

জানিয়া মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কিন্তু এই "সর্ব্বকর্ম্মাণি" পদটীর এই প্রকার তাৎপর্য্যও বলিয়া থাকেন যে এখানে সর্ব্ব শব্দের অর্থ সর্ব্বেশ্বর বাসুদেব, কারণ গীতাতেই শ্রীভগবান্ স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্ভঃ॥"

(বহুজন্ম অতীত হইবার পর "সকলই বাসুদেব" এই প্রকার বুঝিয়া জ্ঞানবান্ আমার শরণাগতিকে লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ জ্ঞানী মহাত্মা এ সংসারে সুদুর্ল্ভ) ইহাই যদি এখানে সর্ব্ব শব্দের অর্থ ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ইহার অর্থ এইরূপ হইয়া থাকে যে, সর্ব্বাত্মরূপে অবস্থিত ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের উদ্দেশে অর্থাৎ তাঁহারই প্রীতি-কামনায় সর্ব্বদা যে কার্য্যপর হইয়া থাকে, সে আমার অর্থাৎ বাসুদেবের অনুগ্রহে শাশ্বত বৈষ্ণব পদ (বিশ্বজনীন প্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ) লাভ করে।

এই স্থলে ইহাও দ্রষ্টব্য "সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি" এই অপি শব্দটীর দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে কথিত জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ ও অধিকারিভেদে অবলম্বনীয় হইতে পারে, ইহাও সূচিত হইতেছে।

এই সকল বস্তুতেই শ্রীভগবানকে দেখিয়া তাঁহারই সর্ব্বপ্রকার সেবারূপ বিশ্বজনীন প্রেমই—সংহিতারূপ শ্রুতি হইতে আরম্ভ করিয়া উপনিষদ, ব্রাহ্মণ, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণে ও আগমশাস্ত্রে কোথায়ও অল্পবিস্তরভাবে ইঙ্গিতে, কোথায়ও বা ব্যক্তভাবে সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মরূপে অভিহিত হইয়াছে।

ইহাই আর্ষযুগের বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ, আর্ষযুগের পর দর্শনাচার্য্যগণের যুগে এই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃতি বস্তুত এক হইলেও শিক্ষাদীক্ষা সংস্কার ও সাধনার বৈলক্ষণ্যবশতঃ বাহিরে নানা আকার ধারণ করিয়াছিল। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের উপাসনা কখনও দার্শনিক ভাবে কখনও বা আলঙ্কারিক ভাবে বিশাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ সমূহে নূতন নূতন আকারের বৈষ্ণবভাবপ্রবাহের সৃষ্টি করিতেছিল এবং সেইভাবপ্রবাহে নিমগ্ন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধুমহাত্মাগণের ভক্তিপূত-নির্ম্মল-সর্ব্বভূত হিতোদ্যত পুণ্য-চরিতাবলীর শান্তোজ্জ্বল যশোজ্যোৎস্নায় ভারতের অধ্যাত্মরাজ্য পুষ্ট ও উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে। এই সকল ভারতের অধ্যাত্মাকাশের সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে আচার্য্য রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী ও বল্লভাচার্য্যের নাম ভারতের অধ্যাত্মরাজ্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মের গতি ও প্রসার বিষয়ে সংস্কৃত গ্রন্থে যাহা পাওয়া যায়, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া যত সম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রসার ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, অগ্রে দক্ষিণে দ্রবিড় দেশে তামিল ভাষায় রচিত দ্রাবিড়াম্নায় নামে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগ্রন্থনিবহের প্রতি মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাত একান্ত আবশ্যক। এই কারণে তাহারও কিঞ্চিৎ অনুশীলনও করা যাইতেছে।

৺শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়—

"কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ॥"
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী॥
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজাঃ মনুজেশ্বর॥
প্রায়োভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ॥

(৩৮।৪০ শ্লোক)

হে রাজন্, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে যে সকল প্রজা জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যে বহু ব্যক্তিই কলিযুগে যেন আমাদের জন্ম হয়—এইরূপ ইচ্ছা করে। কারণ কলিযুগে নারায়ণ-পরায়ণ মানুষগণ অধিক সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কোন কোন স্থানে তাহাদের সংখ্যা অল্প হইলেও দ্রাবিড়প্রদেশে তাহাদের সংখ্যা অধিকই হইয়া থাকে। তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, মহাপুণ্যা, কাবেরী এবং পশ্চিম ভাগে মহানদী, এই কয়টী নদীর জল যে সকল মানব পান করিয়া থাকে, তাহারা প্রায়ই শ্রীভগবান্ বাসুদেবের ভক্ত হয় এবং তাহাদের অন্তঃকরণও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতের নির্ম্মাণকাল লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মধ্যে মতবিরোধ এখনও সমাহিত হয় নাই। তাহা লইয়া গবেষণা করা এখানে সম্ভবপর নহে। তবে একথা নিশ্চয় সহকারে বলিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বৈষ্ণবাচার্য্য স্বকৃত সংস্কৃতগ্রন্থে ভাগবতের উল্লেখ করেন নাই—বৈষ্ণবসম্প্রদায় প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণের অন্যতম আনন্দতীর্থ প্রমাণরূপে ভাগবতকে স্বীকার করিয়া

ইহার অনেক শ্লোকই স্বগ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই আনন্দতীর্থ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন, মুগ্ধবোধরচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ বোপদেব পণ্ডিতও আনন্দতীর্থের সমসাময়িক। তিনিও মুক্তাফল গ্রন্থে ভাগবতের বহু শ্লোক সংগ্রহ করিয়া ব্যাখা করিয়াছেন।

সুতরাং খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রচার যে ছিল, সে বিষয়ে কোন নির্ব্বিসংবাদ প্রমাণ এখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই, ইহা স্থির।

ভাগবতে দ্রাবিড় দেশে বৈষ্ণব ভক্তগণের আধিক্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। আচার্য্য রামানুজ দক্ষিণ দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন কিন্তু, তিনি ভাগবতের পঞ্চরস-প্রবণ বৈষ্ণবোপাসনামার্গের কোন প্রকার ইঙ্গিত স্বগ্রন্থে কোন স্থানেই করেন নাই এবং ভাগবতের কোন বচনও উদ্ধৃত করেন নাই। অথচ বিষ্ণুপুরাণের বহুবচনই প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়া তিনি ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে আচার্য্য রামানুজের বর্ণিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিষ্ণুপুরাণের বচনসমষ্টির উপরই বেশীভাবে নির্ভর করে।

কিন্তু, তাঁহার জন্মগ্রহণের অন্ততঃ হাজার বৎসর পূর্ব্বে দ্রাবিড় দেশে তামিল ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহে একটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সম্প্রদায়ের নাম আলবার (Alvar)। আলবার-সম্প্রদায়ের অধিকাংশ গ্রন্থই তামিলভাষার লিখিত। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই এই সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা চতুর্ভুজ

বাসুদেবের বামে লক্ষ্মীমূর্ত্তির পূজা ইঁহারা প্রচুরভাবে করিয়া থাকেন।

আল্‌বার সম্প্রদায়ে দ্বাদশজন আচার্য্য বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, যথাক্রমে ইঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রাচীনতম
১ ॥ সারযোগী।
২ ॥ ভূতযোগী।
৩ ॥ মহদ্‌যোগী অথবা ভ্রান্তযোগী।
৪ ॥ ভক্তিসার।

প্রাচীনতর
৫ ॥ শঠকোপ বা শঠারি।
৬ ॥ মধুর কবি।
৭ ॥ কুলশেখর।
৮ ॥ বিষ্ণুচিত্ত।
৯ ॥ গোদ।
১০ ॥ ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু।
১১ ॥ যোগিবাহন।
১২ ॥ পরকাল।

স্যার আর্. জি. ভাণ্ডারকর Vaisnavism নামক স্বগ্রন্থে দ্বাদশজন আল্‌বারের যে তালিকা ও তাঁহাদের সংস্কৃত নাম ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই এই স্থানে উদ্ধৃত হইল, দ্রাবিড়াম্নায়—যাহা তামিল অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা হইতে যে দ্বাদশ জন আলবারের দ্রবিড় নামও পাওয়া গিয়াছে, তাহা কিন্তু এইরূপ—

১। কোই হৈ আলবার
২। ভূত ঐ

৩। পৈ ঐ
৪। তিরুমলিকৈ ঐ
৫। নম্মা ঐ (ইহাঁরই সংস্কৃত নাম শঠারি)
৬। মধুর কবি ঐ
৭। কুলশেখর ঐ
৮। পিরিয় ঐ
৯। আণ্ডাল ঐ (ইনি স্ত্রীজাতি)
১০। তোণ্ডর অলি আলবার
১১। তিরুপ্ পান ঐ
১২। তিরুমঙ্গই ঐ

এস্. কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গারের মতে সারযোগীর সময় খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৭০৬ বৎসর। আর অন্তিম 'পরকাল' খ্রীষ্টজন্মের ২৭০৬ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। স্যার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতে ইঁহাদের এত প্রাচীনকালে অবস্থিতি শুধু কিংবদন্তীর উপরই নির্ভর করে, বাস্তবপক্ষে ইহা প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় না, প্রত্যুত, ইহা প্রমাণবিরুদ্ধ। কারণ এই দ্বাদশ জন আলবারগণের মধ্যে সপ্তম আচার্য্য কুল-শেখর যে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে জীবিত ছিলেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

এস্. কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গারই আরএক স্থলে কিন্তু ইহাও বলিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কুল-শেখর জীবিত ছিলেন। কুলশেখর ত্রিবাঙ্কুরের রাজা ছিলেন। এই কুলশেখর মুকুন্দমালা নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ ॥"

শ্রীমদ্‌ভাগবত ১১।২।৩৬॥

(দেহ, বাক্য, মন ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও আত্মার দ্বারা প্রকৃতি বশতঃ যে কিছু কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সকলই নারায়ণকে নমস্কার—এই বলিয়া সেই পরম পুরুষকে সমর্পণ করিবে। স্যার ভাণ্ডারকর বলেন মুকুন্দ-মালার রচয়িতা ত্রিবাঙ্কুররাজ কুলশেখর যিনি আলবার নামে প্রথিত, তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। ইহার পূর্ব্বকালবর্ত্তী তিনি কিছুতেই হইতে পারেন না। স্যার ভাণ্ডারকরের সিদ্ধান্ত এই যে সর্ব্ব-প্রথম আলবার আচার্য্য সারযোগী খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ, বা পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন এ বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণও পাওয়া যায় না এবং দৃঢ়তর প্রমাণ দ্বারাও ইহাও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, আলবার কুলশেখর ১১৩৮ হইতে ১১৬০ খ্রীষ্টীয়াব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন, সুতরাং আলবার-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবধর্ম্ম খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে দ্রাবিড় দেশে যে প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

যাহাই হউক না কেন রসভাবপ্রবণ আলবার-সম্প্রদায় সিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে দ্রাবিড়দেশে প্রচলিত ছিল, এবিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মধ্যে যে মতভেদ নাই, ইহাও স্থির।

তামিল ভাষায় রচিত দ্রমিড়োপনিষদ্ বা দ্রাবিড়াম্নায় নামে সুপ্রসিদ্ধ যে বিরাট বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত গ্রন্থ আছে, তাহাতে যে অংশটি শঠারি আলবারের রচিত, এবং যাহা দ্রাবিড়সামবেদ নামে প্রসিদ্ধ, তাহাতে প্রধানভাবে কি কি বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহার একটী তালিকা একখানি সংস্কৃত কবিতাগ্রন্থে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের নাম "দ্রবিড়োপনিষৎতাৎপর্য্যম্"; ইহার রচয়িতার নাম "অভিরামবরাচার্য্য"। এই অভিরাম বরাচার্য্য কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায় নাই।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ আশীর্ব্বাদ-ভাজন ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম্-এর সংগৃহীত হস্তলিখিত প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থের বিশাল লাইব্রেরীতে এই পুস্তকখানি তাঁহারই সৌজন্যে আমার দৃষ্টিগোচর হয়। এই গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় রচিত কবিতাগুলি সুললিত, সরল ও প্রসাদগুণমণ্ডিত। দ্রবিড়োপনিষৎ তাৎপর্য্যের প্রথম শ্লোকেই অভিরাম বরাচার্য্য, সুন্দর বরাচার্য্য নামক মুনিকে স্তুতি করিয়াছেন। এই সুন্দর বরাচার্য্য দ্রবিড়বেদসঙ্গতি নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইহাও এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণশ্লোকেই উক্ত হইয়াছে। এই দ্রবিড়বেদসঙ্গতি গ্রন্থখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার জন্যই অভিরাম বরাচার্য্য এই কবিতা গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাও দ্বিতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ইহার তৃতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, সকল গুণের সাগর আপ্তকাম শৌরি (বাসুদেব) শঠারি নামক মুনিকে অকস্মাৎ দর্শন দান করিয়া চরিতার্থ করিয়া-

ছিলেন। চতুর্থ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, শঠারি অতি শৈশবে সাক্ষাৎ ভগবান্ মুকুন্দকে দেখিয়াছিলেন এবং সেই দর্শন পাইয়াই তিনি বালোচিত স্তন্যপানাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত তিনি মৌনী ছিলেন, এবং সকল প্রকার লোকপ্রসিদ্ধ বালকোচিত ব্যবহার হইতে ত পরাঙ্মুখ থাকিতেন। ষোড়শ বর্ষ অতীত হইলে অকস্মাৎ তাঁহাতে লোকাতীত ভাবাবলীর স্ফূর্ত্তি দেখা দিল, যথা—

যে রাঘবে ভরতলক্ষ্মণ জানকীনাং
যে ঘোষমুগ্ধসুদৃশামপি নন্দসূনৌ।
ভাবা রসৈকবপুষঃ প্রথিতাঃ শঠারি
স্তানেব বা তদধিকান্নুত তত্র লেভে ॥৪॥

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভরত, লক্ষ্মণ ও জানকীর যে ভাব ছিল, ব্রজের মুগ্ধ যোষিদ্‌গণের নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণে সে সকল ভাব ছিল, সেই সকল রসময় ভাব অথবা তাহা হইতে অধিক রসময় ভাবনিচয়, সেই সময় তিনি (শঠারি) লাভ করিয়া-ছিলেন।

প্রহ্লাদ নারদমুখ প্রভবা চ ভক্তিঃ
স্নেহস্তথা দশরথার্জ্জুনবান্ধবোত্থঃ।
সর্ব্বেঽপিতে শঠজিতঃ পুরুষে পরস্মিন্
আনন্দনে পদজুষামতিমাত্রমাসন্ ॥

প্রহ্লাদ ও নারদ প্রভৃতির যে ভক্তি, দশরথ, অর্জ্জুন ও যাদব-বন্ধুগণের যে স্নেহ, তাহাও পদাশ্রিত ভক্তগণের আনন্দপ্রদ সেই পরমপুরুষের প্রতি শঠারি মুনীন্দ্রের অতি-মাত্রায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

ইত্থং হরেরনু ভবামৃত বারিরাশি-
রন্তর্মুনেঃ শঠরিপো রমিতঃ শরীরে।
সূক্ত্যা বহিঃ পরিবহন্ সুতরাং জগন্তি
সদ্যঃসিষেচ ঘনসংসরণানলানি ॥৬॥

এইভাবে মুনীন্দ্র শঠারির অন্তরে শ্রীহরির অনুভবরূপ যে সুধাসমুদ্র আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার শরীরে ক্রমে অমিত হইয়া পড়িল, তখন তাঁহার সুন্দর উক্তিরূপ মার্গদ্বারা তাহা বাহিরেও বহিতে আরম্ভ করিল ও সংসারাগ্নি-তপ্ত ত্রিজগৎকে আপ্লাবিত করিতে লাগিল। পরবর্ত্তী শ্লোকেও কথিত হইয়াছে, জনগণের প্রতি পিতা ও মাতা হইতেও অধিক স্নেহশীল-মুনীন্দ্র শঠারি-আপামরসাধারণ সকলেরই উপকারের জন্য যে সকল উক্তি করিয়াছিলেন তৎসমূহই নিবন্ধ চতুষ্টয়ে প্রবিভক্ত হইয়া আম্নায় বা বেদ নামে প্রথিত হইয়াছে। সত্য সত্যই তাহা মনুষ্যকৃত নহে, তাহা বেদের ন্যায় স্বয়ংই আবির্ভূত।

শ্রীমান্ শঠারির সেই সকল ভাবপ্রবাহময়ী উক্তি সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ হয় নাই বলিয়া, তাহা শিষ্টগণের আদরণীয় হইতে পারে না, এই প্রকার শঙ্কার সমাধান করিবার জন্য পরবর্ত্তী শ্লোকটী রচিত হইয়াছে, যথা—

"শব্দস্য সংস্কৃততয়া যদি গৌরবং স্যাদ্
বৌদ্ধাদি শাস্ত্রবচসামপি তৎ প্রসঙ্গঃ।
বাচ্যেন চেৎ, কথিতমুত্তমবাচ্যমেষু
ভাষানিকর্ষ ইহ তেন ন শক্যশঙ্কঃ ॥"

সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগই যদি গৌরবের হেতু হয়, তবে বৌদ্ধাদি শাস্ত্রবাক্যসমূহের ও সেই গৌরবের প্রসক্তি হয়।

প্রতিপাদ্য অর্থ ই যদি গৌরবের কারণ হয়, তবে এই নিবন্ধ চতুষ্টয়াত্মক তামিল ভাষায় রচিত বেদেও প্রতিপাদ্য বিষয়-সমূহের উত্তমতা আছে বলিয়া, ইহাও বিশেষ গৌরবার্হ, সুতরাং ইহাতে ভাষাপ্রযুক্ত নিকৃষ্টতার শঙ্কা উদিত হইতে পারে না।

দ্রবিড়োপনিৎতাৎপর্য্যের অনেকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইল। বহু উদ্ধরণীয় শ্লোক এই গ্রন্থে থাকিলেও তাহা বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিতে সাহস হয় না, তথাপি প্রকৃতের নিতান্ত উপযোগী বলিয়া আর একটী শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে শ্লোকটী এই—

পুংস্ত্বং নিয়ম্য পুরুষোত্তমতাবিশিষ্টে
স্ত্রীপ্রায়ভাবকথনাজ্জগতোঽখিলস্য॥
পুংসাং চ রঞ্জকবপুর্গুণবত্তয়াঽপি
শৌরেঃ শঠারিযমিনোঽজনি কামিনীত্বম্॥

শাস্ত্রে অখিল বিশ্বেরই স্ত্রীস্বভাবতা আছে ইহা কথিত আছে। এই কারণে সর্ব্বস্বামী শ্রীভগবান্ই পুরুষোত্তম, সেই পুরুষোত্তমেই কেবল পুরুষত্ব আছে। এই প্রকার নিশ্চয় সেই শঠারি মুনির হইয়াছিল বলিরা, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে শ্রীভগবানের শরীর ও গুণরাশি স্ত্রীগণের ন্যায় পুরুষগণেরও মনকে অনুরক্ত করিয়া থাকে, এইজন্য অবশেষে তাহার নিজেরও কামিনীভাব আবির্ভূত হইয়াছিল। বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে এই শ্লোকটীর প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টিপাত আবশ্যক।

পাশ্চাত্য অভিনব কৃষ্টির বিশ্বতোমুখী ও প্রলোভনময়ী আলোকচ্ছটায় হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত হইতেছে বলিয়া

যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের নিকট এই শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ নিশ্চয়ই রুচিপূত বলিয়া প্রতীত হইবে না, প্রত্যুত ইহা ভারতীয়গণের অন্তনিরূঢ় দুররনেয় দাসোচিত ভাবেরই পরিচায়ক বলিয়া, নবভাবে জাগরণশীল শিক্ষিত নর-নারীগণের উপেক্ষণীয়ও হইতে পারে। ইহা জানিয়া শুনিয়াও কেন যে বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্বনির্ণয়প্রসঙ্গে আমি এই শ্লোকটীর অবতারণা করিতে সাহসী হইয়াছি তাহার যথাসম্ভব কৈফিয়ত (Explanation) দেওয়া বোধ করি প্রকৃত পক্ষে অসঙ্গত না হইতে পারে।

নব যুগের নব্যভাব রঞ্জিত নারী প্রগতির শক্তিশালী ও পৃথিবীব্যাপী—এই বিংশশতাব্দীর আন্দোলন আমাদের দেশে আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন নারী জাতির পক্ষে বিশেষও স্থিতিশীল কোন শ্রেয়ঃ সংস্থাপন করিবে কিনা? তাহা শ্রীভগবান্‌ই জানেন। সুতরাঃ সে বিষয়ে গবেষণা করিবার ইহা উপযুক্ত অবসর নহে। স্বাধীনতাপ্রিয়তা বা উচ্ছৃঙ্খলতাপ্রিয়তার গগনস্পর্শী আন্দোলন কোলাহলে মুখরিত এই বর্ত্তমান সময়ে পুরুষ ও স্ত্রীর সভ্য সমাজে তুল্যাধিকারে আপত্তি করিতে যাওয়া যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই যে সাহস বা হঠকারিতার পরিচায়ক, ইহাও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সুবিদিত।

এইরূপ অবস্থায় সকল মানুষের অর্থাৎ পুরুষের ও স্ত্রীত্ব বিধানের অনুকূল ভাবের পোষণকারী এই শ্লোকটীর গূঢ় তাৎপর্য্য অধ্যাত্ম দৃষ্টির দিক্ দিয়া কি হইতে পারে তাহা তত্ত্বান্বেষী সহৃদয় ব্যক্তিগণের ঐকান্তিকভাবে উপেক্ষণীয় নাও হইতে পারে। উপরি উদ্ধৃত শ্লোকে আছে "শঠারি

শমিনোঽভূজনি কামিনীত্বং” শঠারি মুনি কামিনী বা নারী হন নাই কিন্তু, তাঁহার কামিনীত্ব বা নারীত্ব অর্থাৎ কামিনী ভাব বা নারী ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল ইহাই হইল, ইহার যৌগিকার্থ।

এই কামিনীত্ব বা নারীত্ব অর্থাৎ কামিনীভাব বা নারী ভাব, নারী নামে প্রসিদ্ধ পাঞ্চভৌতিক দেহের উপর আত্ম-ভাব বা আত্মীয় ভাব থাকিলেই হইবে, বা না থাকিলে হইবে না, এইরূপ নিয়ম নাই। প্রত্যুত সংসারে অনেক স্থলেই এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়। ভাব প্রতিকূল যে জ্ঞান প্রবণ প্রবৃত্তি তাহারই নাম পুরুষ ভাব। আর জ্ঞান নিরপেক্ষ যে ভাব প্রবণ প্রবৃত্তি। তাহারই নাম নারীভাব বা কামিনীভাব।

প্রাপঞ্চিক বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ বশতঃ স্বতই জীব-হৃদয়ে উদিত জ্ঞানপ্রবণ বা ভাবপ্রবণ প্রবৃত্তির বশে পরিচালিত ব্যক্তি জ্ঞানী বা ভক্ত বলিয়া অধ্যাত্মরাজ্যে পরিগৃহীত হয় না। কিন্তু প্রপঞ্চাতীত অথচ সর্ব্বাত্মভূত বস্তুর প্রতি আকর্ষণ বশতঃ জ্ঞান প্রবণ প্রবৃত্তি বা পুরুষ ভাবের দ্বারা যাহারা পরিচালিত হয়, অধ্যাত্মরাজ্যে তাহারাই জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত। এই প্রপঞ্চাতীত বস্তুর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া যাহারা ভাবপ্রবণ প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহারাই অধ্যাত্মরাজ্যে ভক্ত বা ভাবুক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এই ভক্ত ভাব বা ভাবুকতার যে চরম উৎকর্ষ বা প্রেমলক্ষণা ভক্তি, তাহা সুতরাং নারীভাবে বা কমিনী ভাবেই সম্ভবপর। পুরুষভাবে নহে। সুতরাং শঠারিমুনি অহৈতুকী ভগবৎকৃপায় নারীভাবকেই প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন ইহাই উল্লিখিত শ্লোকের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্যার্থ, বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুশীলন প্রসঙ্গে ইহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নহে, ইহাই আমার বিশ্বাস।

দ্রবিড়োপনিষৎতাৎপর্য্যনামক গ্রন্থখানি হস্তগত হওয়ার পর-তামিল ভাষায় রচিত সুপ্রসিদ্ধ দ্রবিড়াম্নায় বা দ্রবিড়াম্নায়োপনিষদ্‌গ্রন্থ কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগে মীমাংসাশাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রদ্ধেয় চিন্ন স্বামী শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহায্যে আমার হস্তগত হয়, তিনি তামিল ভাষায় সুপণ্ডিত। তাঁহারই সাহয্যে এই গ্রন্থের বহুস্থলের জ্ঞাতব্য বিষয় আমার জ্ঞান গোচর হইয়াছে। তাহাতেই আমি দ্রবিড়াম্নায়ের প্রতিপাদ্য কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয় এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিতে সমর্থ হইয়াছি; এজন্য আমি তাঁহাকে আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জানাইতেছি। দ্রবিড়াম্নায় বৃহৎ গ্রন্থ, তামিলছন্দে রচিত প্রায় চারিহাজার শ্লোক ইহাতে আছে। ইহা চারিখণ্ডে বিভক্ত; ইহার তৃতীয় খণ্ডের নাম দ্রবিড় সামবেদ, এবং ইহাতে একহাজার একশত দুইটী তামিল শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এই খণ্ডেই পঞ্চম আলবার শঠারির জীবনবৃত্তান্ত, তাঁহার সাধনা, সিদ্ধি-লাভ ও সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিস্তারের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। তিনি ৩৮ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন; তাহার মধ্যে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত তিনি একেবারে নির্ব্বাক্ ছিলেন, সর্ব্বদা ধ্যানরত থাকিতেন—কাহারও সহিত কোনপ্রকার বাগ্‌ব্যবহারও করিতেন না। শঠারি জাতিতে শূদ্র ছিলেন। জন্মের পরই তিনি নিষ্ক্রিয় ও স্তব্ধভাবে থাকায় তাঁহার পিতা ভীত হইয়া তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী বিষ্ণুমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে স্থাপন

করেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি হস্তপদাদি চালনা করিতে আরম্ভ করেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তখনই সেই সদ্যোজাত শিশু নিজে উঠিয়া হাঁটিয়া নিকটস্থিত একটী সুবৃহৎ বকুল বৃক্ষের তলায় যাইয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং ষোড়শ বর্ষ বয়ঃ পর্য্যন্ত সেই বকুল তলায় বাস করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি এই সময় প্রায়ই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করিতেন। তাঁহার যখন বয়স ষোল বৎসর, সেই সময়ে মধুরকবি নামে প্রথিত ষষ্ঠ আলবার সেই স্থানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম বাক্যালাপ মধুর কবিরই সহিত হইয়াছিল। শঠারির তিরোভাব তাঁহার ৩৮ বৎসর বয়সেই হইয়াছিল।

শঠারির অন্যতম শিষ্যের নাম নাদমুনি। তাঁহার রচিত একটী সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে, যথা—

"ভক্তামৃতং বিশ্বজনানুমোদনং
সর্ব্বার্থদং শ্রীশঠকোপবাঙ্ময়ম্।
সহস্র শাখোপনিষৎসমাগমম্
নমাম্যহং দ্রাবিড়বেদসাগরম্" ॥

শ্রীশঠকোপ (শঠারি) বাক্যরূপ দ্রবিড় বেদ সাগরকে আমি প্রণাম করিতেছি। এই দ্রাবিড় সামবেদে সহস্র শাখায় উপনিষৎ সমূহও মিলিত হইয়াছে। ইহা ভক্তজনের পক্ষে অমৃতও বিশ্বজনের আনন্দপ্রদ। ইহা সকল প্রকার অভীষ্টকে পূর্ণ করিয়া থাকে।

আচার্য্য রামানুজ সম্প্রদায়ের একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার নাম বেদান্ত দেশিকাচার্য্য। তিনি শঠারিকৃত

দ্রবিড় সামবেদের প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য, তাৎপর্য্য রত্নাবলী নামে একখানি সংস্কৃত কবিতাময় গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধি আছে, এই বেদান্ত দেশিকাচার্য্য বেদব্যাখ্যাতা মাধবাচার্য্যের সমসাময়িক। এই তাৎপর্য্য রত্নাবলীর সপ্তদশ শ্লোকটী এইরূপ

"স্বপ্রাপ্যাসিদ্ধকান্তিং সুঘটিতদয়িতং বিস্ফুরত্তুঙ্গমূর্ত্তিম্
প্রীত্যুন্মেষাদিভোগ্যং নবঘনসুরসং নৈকভূষাদিচিত্রম্॥
প্রখ্যাতপ্রীতিশীলং দুরভিলপরসং সদ্গুণামোদহৃদ্যম্
বিশ্বব্যাবৃত্তিচিত্রং ব্রজযুবতিগণখ্যাতনীত্যাঽম্বভুংক্ত॥

(সেই শঠারি) ব্রজযুবতীগণের প্রখ্যাত নীতি (উপাসনা-মার্গ) অবলম্বন করিয়া শ্রীভগবানকে ভোগ করিয়াছিলেন। ভগবানের কান্তি লোকপ্রসিদ্ধ না হইলেও, তিনি কিন্তু তাহা নিজেরই প্রাপ্য বলিয়া মনে করিতেন। ভগবানের আকার সুঘটিত সুতরাং প্রিয়। তাঁহার মূর্ত্তি সমুন্নত ও দীপ্তিময়। প্রীতির উন্মেষ হইলেই তাঁহাকে ভোগ করিতে পারা যায়। তিনি নবোদিত জলদের ন্যায় কমনীয়। তাঁহার অঙ্গে নানা প্রকার ভূষণাদি আছে বলিয়া তিনি বড়ই বিস্ময়াবহ। তাঁহার প্রীতি ও শীল ভুবনে প্রখ্যাত। তিনি রসস্বরূপ অথচ সে রসের স্বরূপ কি তাহা বাক্যের অগোচর। ভগবান্ বিশ্ব হইতে বিলক্ষণ ও সকলেরই বিস্ময়জনক।

এই শ্লোকটীতে ব্রজসুন্দরীগণের সুপ্রসিদ্ধ রসভাবসমন্বিত রীতিতে শ্রীভগবানের উপাসনার স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। ভগবান্ প্রীতিময়; প্রীতির উন্মেষ ব্যতিরেকে তাঁহার সাক্ষাদ্-দর্শন হইতে পারে না। এই ভাবেরই উপাসনা করিয়া শঠারি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহাও এই শ্লোকে স্পষ্ট

দেখা যাইতেছে। এই গ্রন্থের উপসংহারে ১১৬তম শ্লোকে চারিভাগে বিভক্ত শঠারি প্রণীত দ্রবিড় সামবেদে প্রধানতঃ কি কি বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাও বলা হইয়াছে, যথা—

"আদ্যেস্বীয়প্রবন্ধে শঠজিদভিদধে সংসৃতের্দুঃসহত্বং
দ্বৈতীয়ীকে স্বরূপাদ্যখিলমথ হরেরস্বভূৎ স্পষ্টদৃষ্টম্।
তার্তীয়ীকে স্বকীয়াং ভগবদনুভবে স্ফোরয়ামাস তীব্রা
মাশাংতুর্য্যে যথেষ্টাং ভগবদনুভবাদাপ মুক্তিং শঠারিঃ" ॥

স্বরচিত প্রবন্ধের প্রথম ভাগে শঠারি সংসারের দুঃসহত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন,দ্বিতীয় ভাগে শ্রীহরির স্বরূপ প্রভৃতি—যাহা তিনি স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন, তাহাই বুঝাইয়াছেন, তৃতীয় ভাগে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ অনুভবের পর তাঁহাকে পাইবার জন্য তাঁহার তীব্র আশা কি প্রকার হইয়াছিল তাহাই উপনিবদ্ধ করিয়াছেন, চতুর্থভাগে তিনি শ্রীভগবানের অনুভব-প্রভাবে প্রাপ্ত স্বীয় অভিমত মুক্তির স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও এই নারীভাব—অর্থাৎ পূর্ণানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের ভাবপ্রধান অনুভূতি হইতে উৎপন্ন যে আত্ম-বিসর্জ্জন ও সেবাপরতা, তাহাই পরা বা অহৈতুকী ভক্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই অহৈতুকী ভক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ স্বরূপ ব্রজের গোপললনাগণকে লক্ষ্য করিয়া করিয়া তাই উদ্ধবও বলিয়াছিলেন—

"আসামহং চরণরেণুজুষামহো স্যাম্
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।

সা দুস্ত্যজং স্বজন মার্য্যপথং চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং মুনিভির্বিমৃগ্যাম্" ॥

মরণের পর আবার যদি এই পৃথিবীতে জন্ম লইতে হয়, তাহা হইলে আমি যেন এই ব্রজললনাগণের চরণের রেণু যাহাদের উপর পতিত হয়, বৃন্দাবনের এমন কোন গুল্মলতা বা ধান্য, যব প্রভৃতি ঔষধির মধ্যে জন্মলাভ করি। এই ব্রজাঙ্গনাগণ দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্য্য পথকে পরিত্যাগ করিয়া মুনিগণেরও অন্বেষণীয় মুকুন্দ পদবীকেই ভজনা করিয়াছেন।

এই উদ্ধব বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণবিরহব্যাকুল ব্রজসুন্দরীগণকে সংসারের মায়িকতা সংস্থাপন দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য, উদ্দেশ্য—অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিয়া ব্রজগোপীগণ বৈরাগ্য লাভ করিবেন, তাহার ফলে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের-প্রতি আসক্তি বিলয়প্রাপ্ত হইবে এবং তন্মূলক দারুণ শ্রীকৃষ্ণবিরহব্যথা ও উপশমিত হইবে। গোপীগণকে কৃষ্ণপ্রীতি বিসর্জ্জনের উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত জ্ঞানী উদ্ধব পূর্ব্বে কৃষ্ণাসক্তির স্বরূপ জানিতেন না—বিরহ ও মিলনের দাহময় অথচ তৃপ্তিময় সংমিশ্রণেই মানবের পূর্ণতা, একথা ব্রজে আসিবার পূর্ব্বে তিনি জানিবেন কিরূপে? তাই গোপীভাবের উপাসকশ্রেষ্ঠ শ্রীরূপগোস্বামী ও বিদগ্ধ মাধবে বলিয়াছেন—

"পীড়াভির্নবকাল কূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্বাসনো
নিঃষ্যন্দেন মুদং সুধামধুরিমাহঙ্কার সংকোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরা জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ"।

এই গোপী সমাশ্বাসনের দুর্ব্বহ গুরুভার যাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল সেই উদ্ধবের পরিচয় দিতে যাইয়া ভাগবত রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীশুকমুখে বলিতেছেন্‌

"বৃষ্ণীনাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা।
শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ" ॥

উদ্ধব যদুবংশের শ্রেষ্ঠপুরুষ, বৃহস্পতির তিনি সাক্ষাৎ শিষ্য, তত্ত্ববিদ্‌গণের অগ্রণী, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সখা ছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখা যায় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে একদিন নিভৃতে ডাকাইয়া আদরে তাঁহার পাণি নিজ পাণিতে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,উদ্ধব! তুমি পিতা নন্দ এবং মাতা যশোমতীর প্রীতিসম্পাদনের জন্য বৃন্দাবনে যাও ও গোপীগণের আমার বিরহে যে দুঃখানল সন্ধুক্ষিত হইতেছে, তাহা আমার সন্দেশ-বচনের দ্বারা নির্ব্বাপিত করিয়া এস। তত্ত্ববিদ্‌গণের অগ্রণী বৃহস্পতির প্রিয়শিষ্য উদ্ধব, প্রপন্নার্ত্তিহর শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, এবং খুব জাঁকালভাবে তত্ত্বজ্ঞানের ও বৈরাগ্যের উপদেশ ও উদ্ধব ব্রজগোপীগণের সম্মুখে দিয়াছিলেন কিন্তু, উদ্ধবের মুখে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ শুনিয়া গোপীর বিরহাগ্নি প্রশমিত হইয়াছিল কিনা তাহা স্পষ্ট করিয়া শুকদেব বলেন নাই; কিন্তু বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণবিরহাগ্নি-প্রতপ্ত গোপীগণে কৃষ্ণপ্রেমের মূর্ত্ত বিকাশ দেখিয়া, উদ্ধবের অদ্বয়তত্ত্বজ্ঞানের বিরাট শৈল যে ধ্বসিয়া গিয়াছিল, এবং তাঁহার জ্ঞানাগ্নি জনিত সকল আর্ত্তিই যে অনন্তকালের জন্য প্রশমিত হইয়াছিল, বৃন্দাবন পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে উদ্ধবের এই "আসামহং" ইত্যাদি শ্লোকটীই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ইহাই হইল অধ্যাত্ম শাস্ত্রের নারীর ভাব এবং এই

নারীভাবের সার গোপীভাবই হইল শ্রীমদ্‌ভাগবতবর্ণিত বৈষ্ণব ভাবের চরম উৎকর্ষ, শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই গোপীভাবেরই অন্তর্নিহিত। দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় দেশে আল্‌বার সম্প্রদায়ে এই গোপীভাবের আভাস দ্রবিড়াম্নায়ে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার মূল শ্রীমদ্‌ভাগবত কিনা তদ্বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। আলবার সম্প্রদায়ের আবির্ভাব কাল যদি স্যার আর, জি, ভাণ্ডারকরের মতানুসারেই গৃহীত হয়, তাহা হইলে শঠ-রিপুর সময়ে দক্ষিণ-ভারতে শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুশীলন অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। শ্রীমদ্‌ ভাগবতে গোপীভাবের যেরূপ পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, শঠরিপুর দ্রবিড়াম্নায়ে কিন্তু, তাহা অপরিস্ফুট, এবং তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতের গোপীভাবের ন্যায় দার্শনিক ও আলঙ্কারিক সম্মত রসানুকূল ভাব বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা তাহাও প্রণিধান সহকারে আলোচনীয়। এই কারণে শ্রীমদ্‌ ভাগবতের সহিত দ্রবিড়াম্নায়ের উপজীব্যোপজীবক ভাব সম্বন্ধে নির্ণয় সহকারে কিছু বলা বড়ই কঠিন।

সে যাহাই হউক শ্রীমদ্‌ভাগবতের বৈষ্ণব ধর্ম্ম খ্রীষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দী হইতে ভারতের শিষ্টসম্প্রদায়ে যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিও পাইতেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন হেতু এখনও উপলব্ধ হয় নাই। কিন্তু ইহাও স্থির যে এই শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রতিপাদিত গোপীভাবপ্রবণ বৈষ্ণবসাধনা আচার্য্য শ্রীরামানুজ ও মধ্ব কর্তৃক অঙ্গীকৃত ও প্রচারিত হয় নাই বলিয়া, তত্তৎ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের মধ্যে ইহার তেমন

আদর নাই। নিম্বার্ক ও বিষ্ণুস্বামী প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ইহা আংশিকভাবে সমাদৃত হইলেও মধুররসের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা ও তদাস্বাদনানুকূল সাধনার প্রবর্ত্তন উক্ত সম্প্রদায়দ্বয়ে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে অঙ্গীকৃত হইয়াছিল তাহার উল্লেখযোগ্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাঙ্গলায় মধুর রসপ্রধান বৈষ্ণব সাধন প্রণালী যে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত ছিল তাহার পরিচয় জয়দেব, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের কবিতায় কিছু কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে শান্ত দাস্য সখ্য এবং বাৎসল্য এই চতুর্ব্বিধ ভক্তিরসের উল্লেখ পাওয়া যায় না। মধুর রসের প্রকর্ষ তাহাতে পরিদৃষ্ট হইলেও তদা স্বাদনানুকূল কোন প্রকার বিশিষ্ট সাধনা-পদ্ধতি যে বাঙ্গালার সাধারণ জনগণের মধ্যে বা শিষ্ট ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তৎকালে প্রচলিত ছিল তাহারও প্রমাণ নাই।

রাধাতন্ত্র গোতমীয় তন্ত্র বিষ্ণু-যামল প্রভৃতি কতিপয় তন্ত্রে এই বিষয়ে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে, ইহা সত্য, কিন্তু তন্মূলক সুশৃঙ্খল বৈষ্ণবসাধনপ্রণালী শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহার কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। আসল কথা এই যে, মানস বৃন্দাবনে সিদ্ধদেহে বাসপূর্ব্বক মহাভাবরূপিণী শ্রীরাধার সঞ্চারিভাবস্বরূপা সখীগণের আনুগত্য দ্বারা রসরাজমূর্ত্তি রসিকরাজশেখর শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসম্পাদনের জন্যই জীবন উৎসর্গ করা রূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে বৈশিষ্ট্য, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বা ভারতের অন্য কোন প্রদেশে প্রচারিত হইয়াছিল বা অনুষ্ঠিত

হইত, তাহার কোন প্রমাণ সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষাতে লিখিত বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায় না; সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যাহা সারাংশ, তাহা অন্য কোন দেশে প্রচলিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে যে গৃহীত হয় নাই, ইহা স্থির।

এইত হইল শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বকালে বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্মের অবস্থা। কিন্তু, মহাপ্রভুর আবির্ভাবকাল হইতে বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্মের ক্ষীণকায়া মৃদুমন্দ-বাহিনী ভাব-নির্ঝরিণীতে যে প্রবল বন্যা আসিল, যে উত্তাল তরঙ্গমালা উঠিল, সেই তরঙ্গমালাসঙ্কুল বন্যার উদ্দাম ও অনিবার্য্য উভয় তটপ্লাবিনী—বহুমুখী গতি নবদ্বীপ প্লাবিত করিয়া শান্তিপুর ভাসাইয়া বাঙ্গালার বাহিরেও তীব্রবেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল, দক্ষিণে নীলাচলকে কেন্দ্র করিয়া কৃষ্ণা-কাবেরী-তুঙ্গভদ্রা প্রভৃতি পুণ্য-নদীর অমল সলিলধারাসিক্ত প্রদেশ নিচয়কে প্লাবিত করিয়া তাহা দক্ষিণ সমুদ্রের বেলাভূমি পর্য্যন্ত পৌছিল। উত্তরে কটক ও ঝাড়িখণ্ড প্রভৃতি ঘন বন-রাজিবিরাজিত দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া, তাহা বারাণসী, প্রয়াগ ও মথুরা ও রাজপুতানা প্রভৃতি সুদূরবর্ত্তী প্রদেশগুলিকে ও প্লাবিত করিল, এ বৃত্তান্ত আজ শিক্ষিত বাঙ্গালীর সুবিদিত, সুতরাং এ স্থলে তাহারা নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। ভাগবত বর্ণিত-বঙ্গদেশে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকর্ত্তৃক প্রচারিত পঞ্চম পুরুষার্থরূপ ভক্তিময় ও তন্মূলক সাধনাপদ্ধতিসমন্বিত যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম, তাহারই নাম বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্ম। এই বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, ইহার মূল পুরুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ও তদীয় প্রধান

পার্ষদগণের চরিতানুশীলনই প্রথমতঃ ও মুখ্যতঃ কর্ত্তব্য। শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও তাঁহার পার্ষদগণের চরিত সম্বন্ধে প্রত্ন-তাত্ত্বিক মহাপণ্ডিতগণের ধারণা কিরূপ অদ্ভুত, সে বিষয়ে দুই একটি উদাহরণ দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। বর্ত্তমান প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহার আসন অতি উচ্চ, সেই স্যার আর্,জি, ভাণ্ডারকর মহাশয় তাঁহার Vaisnanism নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে Caitanya নামক পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন—

"When he was eighteen years of age, he married a wife of the name of Lachmi Debi and began to live the life of a householder, taking pupils and giving them secular instuc-tion. Soon after he took to a wandering life and visited many places in Eastern Bengal. Begging and singing were of his occupation, and he is said to have collected a great deal of money." (Page 83)

একটু পরেই তিনি লিখিতেছেন—

"Krisnacaitanya, Nityanand and Advaitananda are called the three Prabhus, or masters of the sect. The descendants of Nityananda live at Nadiya, and those of Advaita at Santipur." (Page 85)

নিত্যানন্দের পরিচয় দিতে যাইয়া স্যার ভাণ্ডারকর যাহা বলিয়াছেন তাহাও বিচিত্র—

"The father lived originally in Sylhet in Eastern Bengal, but had emigrated to Nadiya (Nabadvipa) before the birth of Bisvambhar, his yongest son. The eldest son's name was Bisvarupa, who is called Nityananda. (In the history of Chaitanya.)" (Page 83)

নিত্যানন্দের পরিচয় প্রসঙ্গে স্যার্ ভাণ্ডারকর্ অবশেষেও যাহা লিখিয়াছেন তাহাও চমৎকার—

"Nityananda was appointed by Caitanya himself as the superior of the church. His female descendants lived at Balegor, and male ones at Khordu near Barrackpur."

শ্রীগৌরাঙ্গ কোন্ চার্চ্চ সংস্থাপন করিয়াছিলেন বা তাহার সর্ব্বপ্রধান পুরুষরূপে প্রভু নিত্যানন্দকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি অর্থাৎনিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠ সহোদর, এই প্রকার শ্রীচৈতন্যদেবের স্বরূপ ও পার্ষদগণের পরিচয় যিনি দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, তাঁহার হাতে পড়িয়া শ্রীচৈতন্যদেবের যে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে যাইয়া গান গাহিয়া, ভিক্ষা করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ না থাকিলেও দুঃখের বিষয় এই যে, এইরূপ ভ্রান্তিমূলক লেখার ফলে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের যে চিত্র অনভিজ্ঞ পাঠকের হৃদয়ে একবার অঙ্কিত হয়, তাহার পক্ষে তৎপ্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ববোধের সম্ভাবনা প্রায়ই গগনকুসুমতুল্য হইয়া যায়।

স্যার্ ভাণ্ডারকর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রচারিত ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাও তাঁহার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিষয়ে সম্যগ্ দর্শিতার পরিচয় দেয় না, প্রত্যুত ভ্রান্তিকেই প্রকাশ করে, দিঙ্মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"His Parabrahmasakti (power) pervades the universe and assumes a corporeal form by his wonder-creating power (Mayasakti), though he is the soul of all." (Page 84)

শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ Corporeal এবং তাহা মায়াশক্তির দ্বারা রচিত হইরা থাকে, এই বিচিত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত যিনি বিনা সঙ্কোচে শিক্ষিতসম্প্রদায়ে প্রচার করিতে পারেন, তাঁহার সাহস অতুলনীয়।

শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ মায়িক নহে, তাহা নিত্য ও চিদানন্দ-স্বরূপ, ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন।

মায়া শক্তির পরিণাম ঈশ্বর বিগ্রহ, ইহা হইল আচার্য্য শঙ্করের সিদ্ধান্ত। গীতাভাষ্যের প্রথমেই আচার্য্য শঙ্কর ইহা স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—

"স ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্যাজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাবোঽপিসন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাতইব লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্ লক্ষ্যতে"॥

(সেই ভগবান্ সর্ব্বদাই জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল ও তেজঃসম্পন্ন, তিনি ত্রিগুণাত্মিকা নিজ বৈষ্ণবী শক্তি মায়া

অর্থাৎ মূল প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, স্বয়ং অজ ও অব্যয়ভূত এবং সকলেব ঈশ্বব হন্। তিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, ও মুক্ত স্বভাব হইলেও লোকানুগ্রহ করিবাব জন্য যেন দেহবান্ হইয়াছেন, যেন জন্মিয়াছেন এইরূপে লক্ষিত হইয়া থাকেন)

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ যে মায়িক নহে তাহা ব্রহ্মসংহিতাকে বিশদ্‌ভাবে কথিত হইয়াছে, যথা—

"ঈশ্বরঃ পবমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্" ॥ (৫—১)

এই শ্লোকের অর্থ কি তাহা শ্রীচৈতন্যচবিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলিতেছেন—

"কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব বস্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী কিশোবশেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর ॥

(মধ্যখণ্ড, ২০ অধ্যায়)

তাঁহার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কি সিদ্ধান্ত। তাহাও চৈতন্য চরিতামৃতে এইরূপ দেখা যায়—

কৃষ্ণেব যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নর বপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোব নটবর
নবলীলাব হয় অনুরূপ ॥
কৃষ্ণেব মধুর রূপ শুন সনাতন।
সে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ।

যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বপরিণতি
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এইরূপ রতন ভক্তগণের গূঢ় ধন
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে॥

(মধ্যলীলা ২১ পরিচ্ছেদ)

শ্রীমদ্‌ভাগবতেরও ইহাই সিদ্ধান্ত—

"এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃকৃষ্ণাস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ান্তি যুগে যুগে॥"

(১।৩।২৬)

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

(১।২।১১)

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ইহার তাৎপর্য্য-যথা—

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা পরমাত্মা ত্রিবিধ প্রকাশে॥

(মধ্য ২০ পরিচ্ছেদ)

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভগবত্তত্ত্ব বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে তাঁহার লীলাচরিতই অগ্রে অনুশীলনীয়, অন্যান্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণের মত তিনি স্বসিদ্ধান্তপ্রকাশক কোন গ্রন্থ লিখেন নাই। প্রবাদ আছে, তিনি মাত্র কয়েকটী শ্লোক (৮টী মাত্র) সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন; শ্রীরূপগোস্বামীর সঙ্কলিত পদ্যাবলীতেও তাহা সংগৃহীত হইয়াছে, ইহাও লোকমুখেই শুনা যায়। এই পদ্য কয়টীর কিছু আলোচনা পরে করা যাইবে।

তাঁহার চরিতবর্ণনার্থ যে কয়খানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নামক সংস্কৃত নাটকখানি—পরমানন্দ সেন বা কবি কর্ণপূর রচিত। এই পরমানন্দ সেন পুরীতে দীর্ঘকাল শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিশেষ কৃপাপাত্র ও প্রিয় ভক্ত-রূপে বাস করিয়াছিলেন এবং কথিত আছে তিনি প্রায় প্রত্যহই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রসাদ পাইবার অধিকারও লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পরম ভক্ত শিবানন্দ সেন পরমানন্দ সেনের পিতা, সুতরাং চৈতন্যচন্দ্রোদয়-রচয়িতা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের যে চরিতবর্ণনা করিয়াছেন তাঁহা তাহার পুণ্যচরিতানুশীলনের পক্ষে যে বিশেষ আদরণীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়া চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃত এই তিনখানি চৈতন্যচরিত বাঙ্গলা ভাষায় পদ্যে রচিত, কিন্তু, এই তিন খানিই চৈতন্য চন্দ্রোদয়ের পরবর্ত্তী এবং চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের বর্ণিত ঘটনাবলীর উপরই অনেকাংশে নির্ভর করিয়া রচিত হইয়াছে, তাহাও স্থির।

এই সকল চরিতাবলীর সাহায্যে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অলৌকিক ব্যক্তিত্ব ও মত কি তাহা জানিবার প্রযত্ন করা সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক।

চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃতে তাঁহার বাল্যলীলার বর্ণন বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে। এই কয়খানি গ্রন্থেই কিন্তু, তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের রাধাভাবদ্যুতিশবলিত অবতাররূপেই বর্ণন করা হইয়াছে, এই অবতার কিন্তু, পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী অবতারের ন্যায় অসুরভাবাপন্ন ধর্ম্মদ্রোহী ব্যক্তিগণকে নিগৃহীত করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নহে। কিন্তু,

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ॥

(কৃপা করিয়া উন্নতোজ্জ্বলরসা বহুকাল অনর্পিতচরী স্বভক্তিশ্রীকে ভাল করিয়া বিলাইবার জন্য এ কলিকালে শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।)

তিনি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার বা অংশাবতার অথবা অবতারই নহেন এই বিষয় লইয়া বাদবিবাদ করিবার কোন আবশ্যকতা এস্থলে আছে বলিয়া, আমার মনে হয় না। কিন্তু, তাঁহার সেই রাধাভাবদ্যুতিশবলিত সুবিশাল সমুন্নত ও সুগঠিত কনককান্তি গৌরদেহে যে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাহা দীন-দুর্গত, অজ্ঞ-অসহায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর ব্যথিত হৃদয়ের সাংসারিক সকল জ্বালা মিটাইয়া দিবার জন্যই যে অলোক-সামান্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই।

বঙ্গের তাৎকালিক প্রধানতম বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপে উৎকৃষ্ট বৈদিক ব্রাহ্মণকুলে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র নিঃসপত্ন, বিষ্ণুভক্ত ও নিতান্ত সরল প্রকৃতির ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিশেষ ধনবান্ বলিয়া তাঁহার জনসমাজে প্রসিদ্ধি না থাকিলেও তিনি একজন সঙ্গতি-সম্পন্ন এবং নদীয়ার ব্রাহ্মণসমাজে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ তরুণ বয়সেই সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া কোথায় চলিয়া যান, তাহার কোন নির্ণয় করা বড় কঠিন। এই সকল কারণে কনিষ্ঠ ও একমাত্র পুত্র বিশ্বম্ভর অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রতি জগন্নাথ মিশ্র ও তদীয় পত্নী শচীদেবীর আদরাতিশয় ও স্নেহের মাত্রা

যে নিবিড়তর হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। সকলের উপরে ছিল তাঁহার অলোকসামান্য সমুন্নত আকৃতি ও অসাধারণ সৌন্দর্য্য। তাহার উপর ছিল জনক ও জননীর একমাত্র আদুরে ছেলে বলিয়া তাঁহার প্রকৃতির দুর্দ্দমনীয়তা। এই সকল হেতুর সমবায়ে তাঁহার বাল্যজীবনের খেলা-ধূলা বা ব্যবহারপরম্পরা অনেকের পক্ষে অনেকভাবে উদ্বেগজনক হইলেও তাঁহার যে মধুর মূর্ত্তি ও অনিয়ত মধুর ব্যবহার, তাহা নদীয়ার সকল শ্রেণীর নরনারীর হৃদয়ের মধ্যে তাঁহাকে যে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছিল, তাহা অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

তিনি অল্পবয়সেই অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে অধ্যাপনা কিন্তু, ন্যায় বা স্মৃতিশাস্ত্রের নহে, তাহা টীকা-টীপ্পনীসহ কলাপব্যাকরণের মাত্র: কাব্যালঙ্কার শাস্ত্রেও তাঁহার যে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল, সে বিষয়ে কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। ন্যায়শাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্র যে তিনি কোন বিশিষ্ট অধ্যাপকের নিকট পড়িয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ বা প্রসিদ্ধি নাই। অতি শৈশব হইতেই তিনি ভগবন্নাম সঙ্কীর্ত্তনেই তৎপরতা দেখাইতেন, নামসঙ্কীর্ত্তনের সময় প্রায়ই তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইতেন। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, অশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক অনুভাবও বিশিষ্টরূপে তাঁহাতে প্রকাশ পাইত। তাঁহার সঙ্ঘবদ্ধভাবে ও মৃদঙ্গ-করতালিবাদ্যযোগে উচ্চনাম সঙ্কীর্ত্তনে নিরতিশয় প্রীতি হইত। নবদ্বীপের প্রধানতম মুসলমান রাজপুরুষের নিষেধ না মানিয়া তিনি সহস্র সহস্র লোক সঙ্গে নগর সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্কীর্ত্তন মুসলমান

প্রধান রাজপুরুষের দ্বারে তাঁহার সম্মুখেই করিয়াছিলেন, এবং সেই দিন হইতেই এই জাতীয় নগর সংকীর্ত্তনে রাজকীয় নিষেধাজ্ঞাও প্রত্যাহৃত হয়। তিনি নবদ্বীপে অধ্যাপন-কালে একবার পদ্মাপারে পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন, পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রতি পণ্ডিতগণ প্রভূত গৌরব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেখানে বহু ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। প্রচুর পাণ্ডিত্য, খ্যাতি ও অনেক অর্থলাভ করিয়া তিনি নদীয়ায় ফিরিয়াছিলেন। নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই তাঁহার প্রথমা পত্নীর দেহান্ত হওয়ায়, তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন। প্রথমা ও দ্বিতীয়া পত্নীর প্রতি তাঁহার যথেষ্ট প্রীতি ছিল, কখনও তাঁহাদের উপর তিনি কোনও কঠোর ব্যবহার করেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ফিরিবার পর তাঁহার সহিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপেই মিলিত হন। ইহার কিছুদিন পরে শান্তিপুরের বর্ষীয়ান্ পণ্ডিত ভক্তিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সহিত তাঁহার মিলন হয়। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তাঁহার পত্নী সীতাদেবীর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আদেশানুসারেই তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করেন। এই প্রথম সাক্ষাতের পর হইতেই শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তাঁহার ঐকান্তিক ভক্ত ও পার্ষদগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন, বৃন্দাবনদাস চৈতন্য ভাগবতে ইহা স্পষ্ট লিখিয়াছেন। এই সময় হইতে কিন্তু, তিনি অধ্যাপনা-কার্য্যে শৈথিল্য অবলম্বন করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে বায়ুরোগের আক্রমণ হইয়াছে এই প্রকার শঙ্কায় তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার চিকিৎসাও করাইতে আরম্ভ করেন; মধ্যে মধ্যে বিষ্ণু তৈল প্রভৃতির ব্যবহারও তাঁহাকে বাধ্য হইয়া

করিতে হইত, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময়ে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের প্রেরণায় নিত্য নগরে হরিনাম শুনাইতে প্রবৃত্ত নিত্যনন্দের দ্বারা মদ্যপ উচ্ছৃঙ্খল যুবক জগাইও মাধাইএর উদ্ধার সমগ্র নদীয়াবাসীকে বিস্মিত করিয়াছিল, ইহাও সুবিদিত। এই সময়ে তাঁহার প্রাত্যহিক কার্য্য ছিল—প্রাতঃকালে অনুচরবর্গের সহিত ভাগীরথী স্নান প্রসঙ্গে উদ্ধত যুবকের ন্যায় জলকেলি। নিত্যক্রিয়া সমাপনের পর বাটীতে জননী শচীদেবীর স্নেহআদর ও যত্নে রচিত নানা উপকরণ-সমন্বিত অন্নব্যঞ্জন, দধি, ক্ষীরাদি ঘটিত শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ ভক্ষণ, পরে বিশ্রাম, সায়াহ্নে ভক্ত ও পার্ষদগণকে সঙ্গে করিয়া ভাগীরথীতীরে পাদচারণ ও সন্ধ্যাবন্দনাদি, তাহারপর রাত্রিতে শ্রীবাসের গৃহে গমন ও তথায় ভক্তবৃন্দের সহিত হরিকথালাপ, মৃদঙ্গ-করতালাদি যোগে সঙ্কীর্ত্তন। ভক্ত শ্রীবাসের গৃহে কোন কোন দিন শ্রীকৃষ্ণ লীলাভিনয় হইত। এই অভিনয়ে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণ নানা ভূমিকা পরিগ্রহ করিতেন। এই অভিনয় ব্যাপারের সুন্দরও জাজ্জ্বল্যমান বৃত্তান্ত কবি কর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার এই প্রথম যৌবনলীলার সূত্রস্থানীয় একটী শ্লোক কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় চরিতামৃতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"বিদ্যা সৌন্দর্য্য সদ্বেশ সম্ভোগ নৃত্যকীর্ত্তনৈঃ।
প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি যৌবনে"॥

যৌবনে শ্রীগৌরাঙ্গ যে লীলা করিতেছিলেন, তাহার সাধন হইয়াছিল তাঁহার বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, সদ্বেশ, সম্যক্ বিষয়ভোগ, নৃত্য, কীর্ত্তন, প্রেম ও নাম প্রদান।

এই সময়ে পিতৃক্রিয়ার উদ্দেশে শ্রীগৌরাঙ্গদেব গয়াতীর্থে গমন করেন। সেইখানে তাঁহার সহিত পরম ভাগবত সন্ন্যাসী শ্রীঈশ্বর পুরীর দেখা হয়। নবদ্বীপে পূর্ব্বেও তিনি ঈশ্বর পুরীকে দেখিয়াছিলেন কিন্তু, গয়াতে তাঁহার সহিত দর্শন ও বার্ত্তালাপের পর শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনের গতি এক নূতন আকারের পরিবর্ত্তন লাভ করিল, তিনি কৃষ্ণ বিরহের তীব্র অনুভূতির বশে নিতান্ত ব্যাকুল ভাবপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ বিরহব্যাকুলতা প্রকাশ তাহার জীবনে এই প্রথম, এই বিরহ ব্যাকুলতায় কিন্তু, মধুর ভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না, প্রত্যুত ইহা বাৎসল্যের অনুভাবই বিশেষ বলিয়াই মনে হয়। ঈশ্বর পুরীর চলিয়া যাওয়ার পর তিনি নিতান্ত অন্যমনা হইয়া উঠেন, একদিন তিনি একান্তে বসিয়া ধ্যানমগ্ন ছিলেন হঠাৎ কান্দিয়া উঠিলেন এবং উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন।

"কোথা গেলে বাপ্ কৃষ্ণ ছাড়িয়া আমারে"

চৈতন্য ভাগবত আদি ১২ অধ্যায়

ইহার পর শিষ্যগণের বিশেষ সেবা ও প্রবোধনে তিনি কথঞ্চিত্ প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং তাহাদিগকে

"তোমরা সকলে যাহ ঘরে
মুঞি আর না যাইব সংসার ভিতরে"॥

চৈতন্য ভাগবত ঐ ঐ

এই অবস্থায় তিনি মথুরায় যাইবার জন্য যাত্রা আরম্ভ করেন কিন্তু, কিয়দ্দূর যাইবার পরই সে সংকল্প পরিত্যাগ করেন এবং নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

নবদ্বীপে আসিয়া তিনি যাহা করিতে আরম্ভ করিলেন তাহা তাঁহার পূর্ব্বাভ্যস্ত কার্য্য নহে। ইহা নূতন ভাবের নূতন কার্য্য।

ফিরিয়া আসিয়া তিনি দিন কয়েক ছাত্র পড়াইতে বসিলেন বটে, কিন্তু, সে পড়ান পূর্ব্বের মত নহে, পড়াইতে বসিয়া তিনি ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন,—শ্রীকৃষ্ণই প্রত্যেক সূত্রের প্রতিপাদ্য, সন্ধি, কারক, সমাস, কৃত্, তদ্ধিত ও ধাতু এ সকলই কৃষ্ণের নাম। এই বিচিত্র নূতন ব্যাখ্যা ছাত্রগণের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না, তাহারা বিস্ফারিত নেত্রে কেবল অধ্যাপকের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে ও দেখিয়া বিস্মিত হয় যে, তাঁহার বাল্যের সে দৃপ্ত ঔদ্ধত্যের কোন চিহ্নই নাই।

"যেই জন আইসে প্রভুরে সম্ভাষিতে।
প্রভুর চরিত্র কেহো না পারে বুঝিতে॥
পূর্ব্ব বিদ্যা ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন;
পরম বিরক্ত প্রায় থাকে সর্ব্বক্ষণ॥"

চৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ড।

এই প্রকার মনের অবস্থায় গতানুগতিক ভাবে অধ্যাপনা আর চলিতে পারে না, সুতরাং বাধ্য হইয়া তিনি অধ্যাপনা কার্য্য হইতে বিরত হইলেন। ছাত্রদিগকে বিদায় দিবার সময় তিনি বলিলেন—

ভাই সব কহিলা সুসত্য।
"আমার এসব কথা অন্যত্র অকথ্য॥
কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সবে দেখো ভাই তাই বোলো সর্ব্বথায়॥

যত ধ্বনি শ্রবণে সকল কৃষ্ণনাম।
সকল ভুবন দেখোঁ গোবিন্দের ধাম ॥
তোমা সভা স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার" ॥

পড়ান বন্ধ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিবাস, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও গদাধর প্রভৃতির সহিত নাম সংকীর্ত্তনানন্দে কিছুকাল নদীয়াতে অতিবাহন করিলেন, এই সময় নাম লইতে লইতে তাঁহার প্রায়ই সংজ্ঞা লোপ হইতে লাগিল। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ ও কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব প্রায়ই দেখা দিতে আরম্ভ করিল, অনেকেই বলিত ইহা বায়ু রোগ ছাড়া আর কিছুই নহে, ভক্তগণের কিন্তু, বিশ্বাস হইল, ইহা প্রেমরূপা ভগবদ্‌ভক্তির উদয়েরই চিহ্ন। এইরূপ অবস্থায় তিনি এমন সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন যে তাহা শুনিয়া তখনকার শিষ্ট সম্প্রদায় নিতান্ত বিস্মিত হইয়া উঠিতেন, নিদর্শনরূপে চৈতন্য ভাগবতের কয়েকটী পয়ার নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম, কভু শাস্ত্র মর্ম্ম নাহি জানে ॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় মাত্র শাস্ত্র বহি মরে ॥
পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারখারে।
কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে ॥"
"চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণবোলে।
বিপ্র নহে বিপ্র, যদি অসৎ পথে চলে" ॥

"দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণ নাম।
সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম" ॥

(চৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ড ১ম অধ্যায়)

সংসারে এই ভাব লইয়া আবদ্ধ থাকা ক্রমেই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। তিনি অবশেষে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য দৃঢ় সংকল্প হইলেন, জননী শচীদেবীকে বুঝাইয়া তাঁহার আজ্ঞাও লইলেন, পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সান্ত্বনা দিলেন, ভক্তগণের নিকটও এই দৃঢ় সংকল্প জানাইলেন। তারপর একদিন একাকী রাত্রি শেষে গৃহত্যাগ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই ভক্তদিগকে জানাইয়াছিলেন, তাঁহারা যেন তাঁহার গৃহত্যাগের পর কাটোয়ায় যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন।

গৃহ হইতে নির্গত হইয়া তিনি হাঁটিয়া গঙ্গাতীর ধরিয়া চলিতে লাগিলেন, কণ্টক নগর অর্থাৎ কাটোয়ার এপারে আসিয়া গঙ্গা পার হইয়া কাটোয়ায় পৌঁছিলেন, এখানে পূর্ব্বসঙ্কেতানুসারে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখরাচার্য্য এবং ব্রহ্মানন্দ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন, এই কয়েক জনকে সঙ্গে লইয়াই তিনি নিজে সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য কেশবভারতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, কেশবভারতী দূর হইতেই তাঁহার অলোকসামান্য দেহকান্তি ও ভাবাবেশ-বিহ্বল গতি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ও দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন, তখন গৌরাঙ্গদেব তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলেন

"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
পতিতপাবন তুমি মহা কৃপাময় ॥

"তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রাণধন।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমাতে ॥
কৃষ্ণদাস হই যেন মোর নহে আন।
হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ দান ॥"

চৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ড

ইহার পব কেশবভারতী তাঁহাকে সন্ন্যাস দীক্ষা প্রদান করিলেন। এই সন্ন্যাস দীক্ষায় তাঁহাব গুরুদত্ত নাম হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ইহার পর তাঁহার শান্তিপুবে অদ্বৈতাচার্য্যেব গৃহে গমন ও কিছুকাল অবস্থিতি, তাহাব পব নীলাচলে গমন, সেখানে কিছুকাল অবস্থান, পবে কাশী, প্রয়াগ, প্রভৃতি দর্শন কবিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ও নীলাচলে অবস্থান, দক্ষিণদেশে যাত্রা, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক অবশিষ্ট আঠারো বৎসর প্রেমভক্তি বিতরণ, সংকীর্ত্তনও উদ্দণ্ড নৃত্যপ্রভৃতি অলৌকিক ভাবাবিষ্ট কার্য্য পরম্পবা, অন্তে বিচিত্র বিস্ময়াবহ তিরোভাব। ইহাই হইল সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনচবিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরিত্র যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, ইঁহাকেই আদর্শ করিয়া ইঁহারই উপদেশ, আদেশও ইঙ্গিত অনুসারে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম উদ্ভাবিত সংস্থাপিত ও প্রসারিত হইয়া এখনও পরিচালিত হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই বিশ্বজনীন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের দার্শনিক সিদ্ধান্ত কি এবং সেই সিদ্ধান্তের অনুযায়ী সাধনা দীক্ষা ও আচার প্রণালীই বা কি, তাহা জানাইবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বয়ং কিছুই লিখিয়া যান নাই, তাঁহার মৌখিক আদেশ অনুসারে তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে কতিপয় অলোকসামান্য প্রতিভাশালী মহাপুরুষ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীজীব গোস্বামীই সর্ব্বপ্রধান। ইঁহারা সংস্কৃত ভাষায় নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে শ্রীরূপ গোস্বামী কোন কোন স্বরচিত গ্রন্থ নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শুনাইতে পারিয়াছিলেন এবং ঐ কয়খানি গ্রন্থ বা তাহার অংশ বিশেষ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পূর্ণভাবে অনুমোদন লাভ করিয়াছিল, ইহাও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামীর রচিত গ্রন্থের মধ্যে বিদগ্ধ মাধব ও ললিতমাধব নামক দুইখানি সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণলীলা নাটক ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থ যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব পুরীতে শ্রবণ

করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ চরিতামৃতে দেখা যায় না। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি ও লঘুভাগবতামৃতই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে আদৃত হইয়া আসিতেছে। এই কয়খানি গ্রন্থ যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব সাক্ষাৎভাবে শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহাতে কিন্তু, কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

শ্রীরূপ গোস্বামীর অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী কৃত গ্রন্থের মধ্যে বৃহদ্ভাগবতামৃত এবং শ্রীমদ্ ভাগবতের টীকা বৃহদ্ বৈষ্ণব তোষণী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে পরমোপযোগী গ্রন্থ, এই গ্রন্থদ্বয় ও যে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রুত বা অনুমোদিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়েও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গাদেবের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে যে দার্শনিক গ্রন্থের অনুশীলন একান্ত আবশ্যক, তাহা শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীজীব গোস্বামী রচিত, এই গ্রন্থখানির নাম ভাগবতসন্দর্ভ, এই গ্রন্থখানি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের তিরোধানের বহু বর্ষ পরে রচিত হইয়াছিল, সুতরাং এই গ্রন্থখানিও যে তিনি দেখেন নাই তাহা নিশ্চিত। এই ভাগবতসন্দর্ভ বা ষট্সন্দর্ভের বিশেষ আলোচনা পরে করা যাইবে, সুতরাং এ স্থানে এসম্বন্ধে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

এই তিন জন গোস্বামীর প্রণীত গ্রন্থসমূহই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রধানতম গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হইয়া আসিতেছে এবং সর্ব্বাংশে হইবারও যে যোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই তিন গোস্বামীর মধ্যে দুই জন অর্থাৎ শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পার্ষদগণের মধ্যে পরিগণিত এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রন্থসমূহের মূল রচয়িতা বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এই দুইজন গোস্বামীর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রথম মিলন গৌড়রাজধানীর নিকটবর্ত্তী গ্রামে রামকেলিতে হইয়াছিল। ইহাদের পাণ্ডিত্য ও বৈষ্ণবতা বিষয়ে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত অনুশীলন একান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামীর বৃদ্ধ প্রপিতামহ কর্ণাটদেশের সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রবাদ আছে তিনি প্রচুর ধনশালী এবং ঐ দেশীয় একজন সামন্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। তিনি অতি ধার্ম্মিক ও নিতান্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন, এই কারণে তিনি লুপ্ত রাজ্যোদ্ধারে কোন প্রকার প্রযত্ন না করিয়া, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতির সহিত কর্ণাট দেশ পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে আগমন পূর্ব্বক স্থায়ীভাবে বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীসনাতন ও রূপ তাঁহারই পঞ্চম অধস্তন পুরুষ। ইহাঁরা কালক্রমে মালদহের নিকটে রামকেলিতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ কর্ণাট পরিত্যাগ করিয়া আসিবার সময় প্রভূত ধন লইয়া আসিয়াছিলেন সুতরাং বঙ্গদেশে ইহারা বিত্তশালী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ গৃহস্থ ভাবে দিনাতিপাত করিতে থাকেন। সনাতন ও রূপ বাল্যকালেই রীতিমত পারসী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাল্যকালে সংস্কৃত ভাষায় কিরূপ পাণ্ডিত্য লাভ হইয়াছিল

তাহার কোন উল্লেখ বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তাঁহাদের চরিত্র ও ব্যবহার নৈপুণ্য এবং যবন ভাষায় বিশিষ্ট অধিকার থাকায়, তৎকালীন গৌড়ের পাতসাহ হুসেনসাহ তাঁহাদিগকে উজীরের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইঁহারা দিবসে রাজকার্য্য সমাধান করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন, তখন বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন ও স্নানানন্তর, শুচি হইয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতেন এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত, ও গীতা প্রভৃতি ভক্তি শাস্ত্রের শ্রবণ ও আলোচনা করিতেন, রাজকার্য্যে নানাপ্রকার যবন সংসর্গ করিতে হইত বলিয়া, সামাজিক ব্যবহারে ইঁহারা আপনাদিগকে হীন বলিয়াই বিবেচনা করিতেন, আস্তিক হিন্দু সমাজ ইহাদের সহিত কিরূপ বব্যহার করিতেন, সে বিষয়ে কোন লিখিত প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার কিছুকাল পরে প্রথম গঙ্গার তীর দিয়া বৃন্দাবন যাইবার জন্য বহির্গত হন, কিন্তু গৌড়রাজধানীর নিকটে রামকেলী ‘গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসেন, এই রামকেলী গ্রামে তাঁহার সনাতন ও রূপের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই প্রথম সাক্ষাতেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের রূপ, লাবণ্য, ঐশ্বর্য্য, মহিমাও ভগবদ্‌ভক্তি প্রভৃতি দেখিয়া দুই ভ্রাতাই তাঁহার প্রতি নিতান্ত আকৃষ্ট হন্ এবং তাঁহারই আশ্রয় প্রার্থনা করেন, কিন্তু, গৌরাঙ্গদেব যথা সময়ে ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিবেন এই আশ্বাস দিয়া, তাঁহাদিগকে আপাততঃ গৃহে ফিরিয়া যাইতেই আদেশ করেন। ইহার কিছুকাল পরে শ্রীসনাতন ও রূপ রাজকার্য্যও গার্হস্থ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাশীতে ও প্রয়াগে যথাক্রমে

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণান্তিকে উপস্থিত হইলেন। বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থোদ্ধার এবং বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন-এই দুই প্রকার মহাকার্য্যের ভার দিয়া, তিনি দুই ভ্রাতাকেই বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। ইহার পরে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত রূপ ও সনাতন নীলাচলে আসিয়া বার কয়েক মিলিয়া ছিলেন। এই মিলনের সময় যথাসম্ভব তাঁহার নিকটে নিজ কার্য্যের পরিচয় তাঁহারা দিয়াছিলেন এবং তাঁহার শ্রীমুখারবৃন্দ হইতে নানাপ্রকার উপদেশও পাইয়াছিলেন। তাঁহারা নীলাচল বাসকালে মহাপ্রভুর প্রেম ভক্তিময় লীলাবলীর ও সাক্ষাৎ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। এই হইল শ্রীগৌরঙ্গদেবের সিদ্ধান্তশাস্ত্র বচয়িতা প্রধান পার্ষদদ্বয়েব সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত।

শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাদেরই নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শ্রীবৃন্দাবনে আসিবাব পূর্ব্বে তিনি কাশীতে আসিয়া কিছুকাল ছিলেন, কাশীতে অবস্থানকালে খুব সম্ভব তিনি অদ্বৈত বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্রেরও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহাঁর সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অধিকার হইয়াছিল। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের সাক্ষাৎ দর্শন পান নাই। বঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভৃতির মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের জীবন কাহিনী এবং তাঁহার অভিমত বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত শুনিয়াছিলেন। এই কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত বিষয়ে তিনি বহু গ্রন্থ বচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহার বচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ভাগবত

সন্দর্ভ নামক গ্রন্থখানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই গ্রন্থের আদর বাঙ্গলার বৈষ্ণব সমাজে বিশেষতঃ পণ্ডিত বৈষ্ণবগণের মধ্যে খুব বেশী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এমন উৎকৃষ্ট দার্শনিক ও ভক্তিগ্রন্থ আর একখানিও রচিত হয় নাই বলিলে, অণু মাত্রও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীজীব গোস্বামীর পর বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও বলদেব বিদ্যাভূষণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বলদেব বিদ্যাভূষণ দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তৎপ্রণীত ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দ ভাষ্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ গৌরববর্দ্ধন করিয়াছে। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শ্রীমদ্‌ভাগবতের ভাবার্থ দীপিকা নামক টীকাগ্রন্থ যেমন সরস, তেমনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং তেমনই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের সুপরিচায়ক। তাহা ছাড়া বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রসকাদম্বিনী প্রভৃতি অনেকগুলি প্রেমভক্তি বিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এসকল গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ ব্যতিরেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের তত্ত্বনির্ণয় সম্যক্ রূপে হইতে পারে না।

কাশীতে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া বেদান্তশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত সন্ন্যাসীগণের অগ্রণী প্রকাশানন্দ স্বামী অদ্বৈত মত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পরম ভক্ত হইয়াছিলেন, তিনি মহাপ্রভুকে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের পরিপূর্ণ অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এবং তাহাঁর জীবনীকে অবলম্বন করিয়া একখানি সংস্কৃত খণ্ড কাব্য ও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কবিতাগুলি যেমন সরল তেমনি সরস, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রচারিত প্রেমভক্তির স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে প্রকাশানন্দের বা প্রবোধানন্দের কবিতা নিচয় বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পার্ষদগণের মধ্যে রামানন্দ রায় একজন প্রধানতম ব্যক্তি, চৈতন্যচন্দ্রোদয় ও চৈতন্য চরিতামৃতে ইহার যেরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে ইনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। গোপী ভাবাবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার প্রকৃত স্বরূপ গোদাবরী তীরে ইঁহার মুখে বহুদিন ধরিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার সর্ব্বথা অনুমোদন করিয়াছিলেন ইহা চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকেও চৈতন্য চরিতামৃতে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরিতাবলী যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনই দুরবগাহ গম্ভীর, তিনি বাল্যকালেই পিতা মাতা স্বজন ও গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়েন এবং অবধূত বেশে বহুকাল ধরিয়া ভারতের নানা দূরবর্ত্তী তীর্থে পর্য্যটন করেন। তিনি প্রথমে যখন নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহিত মিলিত হন্ তখন তাঁহাকে সকলেই অবধূত বলিয়া জানিতেন, নবদ্বীপে হরিনাম প্রচার কার্য্যে ইনিই প্রধানরূপে শ্রীগৌরাঙ্গদেব কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নীচ, উপেক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের উপর ইঁহার কৃপার অবধি ছিল না। অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর ন্যায় ইনি তৎকাল প্রচলিত স্মার্ত্তাচারের পক্ষপাতী ছিলেন না, ইহার নিকটে উচ্চ ও নীচের—স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যের কোন ভেদ ছিল না। যে বিশ্বাসের সহিত হরিনাম করে, যাহার হৃদয়ে ভগবদ্ ভক্তির উদয় হইয়াছে সে অস্পৃশ্য জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার নিকটে অস্পৃশ্য হইত না, তাহার গৃহে

তাহার স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণেও তাঁহার কোন দ্বিধা বোধ ছিল না। চরিতামৃতকার তাঁহার চরিত বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"মোর প্রভু নিত্যানন্দ কৃপা পারাবার।
যে আগে পড়য়ে তার করয়ে উদ্ধার॥"

প্রভু নিত্যানন্দের কোন্ শাস্ত্রে কিরূপ পাণ্ডিত্য ছিল অথবা কোন শাস্ত্র তিনি অধ্যাপকের নিকট কোথাও পড়িয়া ছিলেন, এ বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু বঙ্গীয় বৈষ্ণবসমাজে তাঁহার অলোকসামান্য বিবাট ব্যক্তিত্ব শ্রীগৌরাঙ্গদেবেব পরেই সর্ব্বাপেক্ষা যে জাজ্বল্যমান, তাহাতে সন্দেহ নাই, তিনি প্রথম জীবনে অবধূত ছিলেন অথচ শেষ জীবনে একটী নহে দুইটী বিবাহও কবিয়াছিলেন, তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়েব প্রধানতম পবিচালক পুরুষ হইয়াও নিজগৃহে খড়দহে শক্তি প্রতিমাব উপাসনা কবিতে অণুমাত্র সঙ্কোচ বোধ কবিতেন না। পুবীধামে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের সহিত প্রবেশেব অব্যবহিত পূর্ব্বে, তাঁহাব আজ্ঞা ব্যতিরেকেই জোব কবিয়া তাঁহাবই সন্ন্যাস দণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতে নিত্যানন্দেব কোন সঙ্কোচ বোধ হয় নাই, ভিক্ষান্ন গ্রহণেব পর সেই উচ্ছিষ্টান্ন অদ্বৈতাচার্য্যের গাত্রে উচ্চ হাস্য করিয়া ছড়াইয়া দিতেও তিনি অণুমাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না. অথচ অদ্বৈতাচার্য্যেব প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ নিরতিশয় তাহাব ছিল, ইত্যাদি বিচিত্র কৌতুকময় চরিতাবলীদ্বাবা তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের স্বরূপ কখনও বজ্রেব ন্যায় কঠোর কখনও বা কুসুমেব ন্যায় সুকোমল বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাঁর প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় পাওয়া সহজ সাধ্য নহে।

অদ্বৈতাচার্য্যও নিত্যানন্দের ন্যায় প্রভু শব্দেরদ্বারা বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ গৌরবের সহিত অভিহিত হইয়া থাকেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে আবিসম্বাদিত প্রসিদ্ধি এইরূপ যে এই অদ্বৈতাচার্য্যের কাতর আহ্বানে—তাঁহারই নিত্যপ্রদত্ত তুলসীদল ও গঙ্গাজলের প্রভাবে, অনর্পিতচরী নিজ প্রেমভক্তি আচণ্ডালে বিতরণ করিবার জন্য দীনহীন কাঙ্গাল ভক্তের বেশ ধরিযা বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীহরি নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহার ঘন ঘন সহুঙ্কার হরিবোল ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইত। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও নদীয়ার বিদ্বৎ সমাজে আচার্য্য এই গৌরবাবহ উপাধি দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন। গীতা ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের ভক্তিরস প্রধান ইঁহার সুললিত ব্যাখ্যা কি পণ্ডিত কি প্রাকৃতজন সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করিত। ইনি পরম নিষ্ঠাবান্ সদাচার সম্পন্ন সাত্ত্বিক প্রকৃতির ব্রাহ্মণ বলিয়া সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দের ন্যায় ইঁহারও চরিত সাধারণ বুদ্ধির অগম্য ছিল। উৎকৃষ্ট সদ্ ব্রাহ্মণের দুর্ল্লভতা বশতঃ বঙ্গীয় শিষ্টসমাজে পিতৃশ্রাদ্ধে পাত্রীয়ান্ন ভোজনের জন্য শাস্ত্র বিহিত ব্রাহ্মণ-নিমন্ত্রণ বাঙ্গলাদেশে এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছিল; অদ্বৈতাচার্য্যও এই ব্যবস্থানুসারে পিতৃ শ্রাদ্ধের সময় কুশময় ব্রাহ্মণকেই ব্রাহ্মণের আসনে সন্নিবেশিত করিয়া পাত্রীয়ান্ন সমর্পণ করিতেন। অত্যাচারী ভূস্বামী বুদ্ধিমন্ত খানের উপদ্রবে নিজ-সাধনার পর্ণ কুটীর পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তকুলশ্রেষ্ঠ যবন হরিদাস শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে কিছুকালের জন্য যখন বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময় হইতে হরিদাসের সহিত

অদ্বৈতাচার্য্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই সময়ে অদ্বৈতাচার্য্যের পিতৃশ্রাদ্ধের তিথিতে তিনি পিতৃশ্রাদ্ধের পাত্রীয় অন্নোৎসর্গের জন্য আর কুশময় ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তিনি প্রতিদিন তিনলক্ষ হরিনাম জপপরায়ণ অকপট প্রেমভক্ত যবন হরিদাসকেই পিতৃশ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণের আসনে নিমন্ত্রণ ও বরণ করিয়া বসাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকেই পিতৃশ্রাদ্ধের পাত্রীয়ান্ন ভোজন করাইতে কৈান প্রকার দ্বিধা বোধ করেন নাই।

এইরূপে বরণীয় ব্রাহ্মণের আসনে যথার্থ ভগবদ্‌ভক্ত যবন হরিদাসকে বসাইয়া শ্রাদ্ধীয় পাত্রান্ন ভোজন করাইয়াছিলেন বলিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে সেই সময়ের আস্তিক সমাজে যথেষ্ট অপমান ও লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছিল। কিন্তু শেষে তাঁহারই জয় হইয়াছিল। কারণ, তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা শাস্ত্র নিষিদ্ধ নহে; প্রত্যুত সর্ব্বথা শাস্ত্রানুমোদিত, কারণ,

শ্রীমদ্‌ভাগবতেই উক্ত হইয়াছে—

(ক) বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দাবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ
প্রাণং পুনাতি সকুলং নচ ভূরিমানঃ॥

ভাঃ ৭।৯।১০॥

(খ) অহোবত শ্বপচো হতোগরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্॥
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ভাঃ ৩।৩৩।৭॥

(গ) নমেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং সচ পূজ্যো যথাহ্যহম্॥
(হরিভক্তিবিলাস ১০।৯১ শ্লোক)

এই শ্লোক কয়টীর যথাক্রমে অর্থ এই—

(ক) শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে যাহার ভক্তি নাই, এমতদ্বাদশ প্রকার গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা, যাহার মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত, এইরূপ চাণ্ডালকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়াই আমি মানিয়া থাকি, কারণ এইরূপ চাণ্ডাল-কুলোৎপন্ন ভগবদ্ভক্ত কুলকে পবিত্র করে, প্রভূত অভিমান কিন্তু কুলকে পবিত্র করে না।

(খ) যাঁহাদের জিহ্বাগ্রে তোমার নাম লাগিয়া আছে, হে ভগবন্ তাঁহারা চাণ্ডালকুলোদ্ভূত হইলেও সমধিক গৌরবার্হ। তোমার নাম যাঁহারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সকল প্রকার তপস্যাই করিয়াছেন, সমস্ত যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং তাঁহারাই সকল তীর্থে স্নানও করিয়াছেন।

(গ) যে সমগ্র চারটী বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে, অথচ আমার ভক্ত নহে, সে আমার প্রিয় নহে। কিন্তু চাণ্ডাল-কুলে উৎপন্ন হইয়াও কেহ যদি আমার ভক্ত হয়, তবে সেই আমার প্রিয় হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যক্তিকেই দান করিতে হয় এবং এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিতে হয়। আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) যেমন পূজা করিতে হয়, নীচকুলোৎপন্ন অথচ আমার প্রিয় ভক্তকেও সেইরূপ পূজা করা কর্ত্তব্য। এইত হইল শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রিয়তম পার্ষদগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

এক্ষণে তাঁহার নিজ চরিতেরও কিছু আলোচনা আবশ্যক,

অদ্বৈতাচার্য্য একবার কিছুকালের জন্য কোন কারণে নবদ্বীপ পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিপুরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, এই সময় তিনি প্রত্যহ বিশিষ্ট শ্রোতৃবর্গের মধ্যে ভগবদ্‌গীতার ব্যাখ্যা করিয়া গীতোক্তজ্ঞান বা সাংখ্যযোগের স্বরূপ ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। এই সংবাদ নবদ্বীপে পৌঁছিলে নিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া হঠাৎ শ্রীগৌরাঙ্গদেব শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন তন্ময় হইয়া আচার্য্য ভক্তির চেয়ে জ্ঞানেরই উৎকর্ষ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। সেখানে প্রবেশ করিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গদেব উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসিলেন—

"আরে আরে নাড়া
বোল দেখি জ্ঞান ভক্তি দুইতে কে বাড়া।"

(চৈতন্য ভাঃ মধ্য ১৯ অধ্যায়)

তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহা বিচিত্র

"অদ্বৈত বোলয়ে সর্ব্বকাল বড়জ্ঞান
যার জ্ঞান নাহি, তার ভক্তিতে কি কাম॥
জ্ঞান বড় অদ্বৈতের শুনিয়া বচন।
ক্রোধে বাহ্য পাসরিলা শ্রীশচীনন্দন॥
পিঁড়া হৈতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া"॥

(চৈতন্য ভাঃ মধ্য ১৯ অধ্যায়)

অকস্মাৎ এই উদ্বেগজনক আক্রমণে অদ্বৈতগৃহিণী সীতাদেবী ব্যাকুল হইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন এবং চীৎকার করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—

"বুড়া বিপ্র বুড়া বিপ্র রাখ রাখ প্রাণ।
কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান॥

এত বুড়া বামনেরে কি আর করিবা।
কোন কিছু হৈলে এড়াইতে না পারিবা" ॥
তখন "পতিব্রতা বাক্য শুনি নিত্যানন্দ হাসে।
ভয়ে কৃষ্ণ স্মঙ্‌রয়ে······প্রভু হরিদাসে ॥
ক্রোধে প্রভু পতিব্রতা বাক্য নাহি মানে।
অর্জ্জে গর্জ্জে অদ্বৈতেরে সদম্ভ বচনে ॥
শুতিয়া আছিলু ক্ষীর সাগরের মাঝে।
আরে নাড়া নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর কাজে ॥
ভক্তি প্রকাশিবি তুই আমারে আনিয়া।
এবে বাখানিস জ্ঞান, ভক্তি লুকাইয়া ॥
যদি লুকাইবি ভক্তি তোর চিত্তে আছে।
তবে মোরে প্রকাশ করিলি কোন কাজে" ॥
(চৈতন্য ভাঃ মধ্য ১৯ অধ্যায়)

এই লঘুদণ্ডে গুরু অপরাধের শাস্তি হইল। এই ঘটনার পর কিন্তু, অদ্বৈতাচার্য্যের মুখে আর কখনও অদ্বৈত জ্ঞানের উৎকর্ষ শুনা যায় নাই। তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন, নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণে তাঁহার ভক্তি উত্তরোত্তর বাড়িতেই লাগিল।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নীলাচল লীলা প্রসঙ্গে ছোট হরিদাসের প্রতি (অল্প অপরাধে গুরুতর) দণ্ডের বিধান কিন্তু ইহার বিপরীত। ভগবান্ আচার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পরম ভক্ত বৈষ্ণবগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার গৃহে ভিক্ষা-গ্রহণের জন্য প্রভুর নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। প্রভু ভিক্ষা-গ্রহণের এই নিমন্ত্রণ অঙ্গীকারও করিয়াছিলেন। রন্ধনের সময়ে আচার্য্য দেখিলেন, তণ্ডুল যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রভুর উপযুক্ত

নহে। তাই তিনি প্রভুর একান্ত সেবক কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাসকে জানাইয়া প্রার্থনা করিলেন, প্রভুর জন্য কিছু উৎকৃষ্ট তণ্ডুল সংগ্রহ করিতে। তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে প্রভুর পরম ভক্ত শিখি মাইতির ভগিনী বৃদ্ধা বৈষ্ণবী মাধবী দেবীর গৃহ হইতে হরিদাস প্রভুর আহারের জন্য উৎকৃষ্ট তণ্ডুল চাহিয়া আনিয়া আচার্য্যকে দিয়াছিলেন। যথাকালে মহাপ্রভু ভিক্ষা করিতে আসিলেন, ভোজনে বসিয়া উৎকৃষ্ট তণ্ডুলের সুন্দর অন্ন দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন সুন্দর তণ্ডুল আচার্য্য কোথায় পাইলেন? আচার্য্য নিবেদন করিলেন, ইহা শিখি মাইতির ভগিনী মাধবী দেবীর গৃহ হইতে আনীত হইয়াছে। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, কে ইহা আনিয়াছে? আচার্য্য বলিলেন, আপনার সেবক ছোট হরিদাস ইহা আনিয়াছে। প্রভু আর কিছু বলিলেন না, ভোজনাদি সমাপন করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়াই গোবিন্দকে বলিলেন, দেখ্ গোবিন্দ, তুমি হরিদাসকে বলিয়া দিও সে যেন আর এখানে না আসে। আমি আর তাহার মুখ দেখিব না। স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ইহার কারণ কি জানিতে চাহিলে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব বলিয়াছিলেন, বৈরাগী হইয়া প্রকৃতির সহিত যে সম্ভাষণ করে, আমি তাহার মুখ দেখিতে চাহি না। অপমানে দুঃখে হরিদাস তিনটা উপবাস করিলেন। প্রধান প্রধান ভক্তগণ ক্ষমা করিবার জন্য প্রভুকে অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন, কিন্তু প্রভুর কৃপা হইল না। তিনি ক্ষমা করিলেন না। এই দুঃখে কীর্ত্তনীয়া হরিদাস বড় সাধের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবা পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইলেন এবং পরিশেষে অপমান বিষাদ ও গুরু শোকভার বহনে অসমর্থ হইয়া

প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে ঝাপাইয়া পড়িয়া দেহ বিসর্জ্জন করিলেন।

অপরদিকে আর একটী চিত্রও দেখিবার ও আলোচনার যোগ্য। প্রদ্যুম্ন মিশ্র গৌরাঙ্গদেবের পরম ভক্ত নীলাচলবাসী ব্রাহ্মণ। তিনি মহাপ্রভুর মুখে শ্রীকৃষ্ণ-কথা শুনিবার জন্য লোলুপ হইয়া একদিন উপযুক্ত সময় পাইয়া তাঁহার নিকটে নিজ-প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, আমি কৃষ্ণ-কথা কি বলিতে পারি? আমি রামানন্দ রায়ের মুখে শ্রীকৃষ্ণ-কথা শুনিবার জন্য সর্ব্বদাই উৎসুক থাকি, তুমি তাঁহারই কাছে যাও। তাঁহার মুখে শ্রীকৃষ্ণ কথা শুনিলে তোমার আত্মা চরিতার্থ হইবে। এই আদেশ পাইয়া প্রদ্যুম্ন মিশ্র তখনই রামানন্দ রায়ের ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং রায়ের ভৃত্যকে বলিলেন, আমি আসিয়াছি, রায় মহাশয়কে দেখিতে, এই সংবাদ তুমি এখনই তাঁহাকে জানাও। ভৃত্য উত্তর করিল, রায় মহাশয় এখন গৃহে নাই। তিনি আসিলে দেখা হইবে। আপনি কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া এইখানে বসুন। প্রদ্যুম্ন মিশ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি এখন কোথায়? ভৃত্য কহিল, তিনি বাগান বাড়ীতে গিয়াছেন। সেখানে দুইটী সুন্দরী কিশোরী দেবদাসীকে নৃত্য, গান ও অভিনয়ের অনুকূল ভাবভঙ্গী প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য উদ্যান-বাটীতে তিনি প্রত্যহই যাইয়া থাকেন। আজিও সেই কার্য্যের জন্য গিয়াছেন। সেখানে আমাদের কাহারও যাওয়া নিষিদ্ধ; কেহই এ সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পায় না। নিভৃত গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি কিশোরীদ্বয়কে এইরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন। ভৃত্যের কথা শুনিয়া প্রদ্যুম্ন মিশ্র বড়ই

বিরক্তি বোধ করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, মহাপ্রভু বাছিয়া বাছিয়া এমনই প্রকৃতির লোকের কাছে কৃষ্ণ-কথা শুনিবার জন্য আমাকে পাঠাইলেন, ইহার উদ্দেশ্য কি? যাহা হউক, তিনি প্রাতঃকাল হইতে সার্দ্ধদ্বিতীয় প্রহরকাল পর্য্যন্ত রায়ের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। বিলম্বে রায় ফিরিয়া আসিয়া প্রত্যুম্ন মিশ্রের চরণে দণ্ডবৎপ্রণত হইয়া বলিলেন, প্রভু আপনি আসিয়া এতক্ষণ এই অধমের প্রতীক্ষা করিতেছেন, অথচ সংবাদ কেহই আমাকে জানাইল না। ইহার জন্য বড়ই দুঃখিত হইলাম। আপনি আমার অজ্ঞান-কৃত এই অপরাধ কৃপা করিয়া ক্ষমা করুন। ইহার উত্তরে প্রত্যুম্ন মিশ্র বলিলেন, আপনাকে দেখিবার জন্য আসিয়া-ছিলাম। আপনার দর্শনে আমি চরিতার্থ হইয়াছি, আমি এখন যাইতেছি। এই বলিয়া প্রত্যুম্ন মিশ্র ফিরিয়া আসিলেন। দুই একদিন পরে যখন আবার মহাপ্রভুর নিকট যাইয়া দর্শন ও প্রণামাদি করিলেন, তখন ব্যস্ততার সহিত অগ্রেই মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রত্যুম্ন মিশ্র, রামানন্দের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ-কথা শুনিয়াছ ত? ইহার পর প্রত্যুম্ন মিশ্রের মনের ভাব বুঝিয়া তিনি যাহা বলিলেন, তাহা চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে। যথা :—

"নির্বিকার দেহমন কাষ্ঠ পাষাণ সম।
আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্বিকার মন॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥
তাঁহার মনের ভাব তেঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবার আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥

ইহাই হইল শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ও তাঁহার পার্ষদগণের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

এই প্রকার পার্ষদগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপে, নীলাচলে, প্রয়াগে, বৃন্দাবনে ও বারাণসীতে যে সকল লীলা করিয়াছিলেন, আদেশ বা উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী তৎসম্প্রদায়ভুক্ত গোস্বামী এবং পণ্ডিতগণ সংস্কৃত বা বাঙ্গালায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থের সাহায্য ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা বুঝিবার বা বুঝাইবার অন্য কোন উপায় নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত প্রধানতঃ সাধ্য সাধন তত্ত্ব এবং সাধ্য ও সাধনের সম্বন্ধ। এই সিদ্ধান্ত বুঝাইবার জন্য শ্রীজীব গোস্বামী যে অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম ভাগবতসন্দর্ভ বা ষট্ সন্দর্ভ, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই ভাগবত সন্দর্ভ একাধারে দর্শন শাস্ত্র ও উপাসনাশাস্ত্রের অদ্বিতীয় সমন্বয় গ্রন্থ, এরূপ গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় আর একখানিও নাই বলিলে অণুমাত্রও অত্যুক্তি হয় না। আস্তিক দর্শনশাস্ত্র সমূহের পরস্পর-বিরোধি মতের সমন্বয় করিবার জন্য অনার্য্য যুগে এ পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় যত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ভাগবত সন্দর্ভ তাহাদের মধ্যে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট এবং অতুলনীয় গ্রন্থ। দুঃখের বিষয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাঁরা প্রবিষ্ট নহেন, অথচ দর্শন শাস্ত্রে যাহাঁরা সুপণ্ডিত বলিয়া ভারতীয় বিদ্বৎসমাজে বিশেষ ভাবে সম্মানিত ও সুপ্রসিদ্ধ, তাঁহারা কেহই এই গ্রন্থ খানির সম্যক্ অনুশীলন করেন না; সুতরাং

ভারতীয় দার্শনিকসম্প্রদায়ে ইহার যে প্রকার আদর হওয়া উচিত, এখনও তাহা হয় নাই।

ভাগবত সন্দর্ভে পরমাত্মা, শ্রীভগবান্ ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ কি, তাহা অগ্রে নিরূপণ করিয়া, শ্রীজীব গোস্বামী সাধন ভক্তি ও সাধ্য ভক্তির স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। সাধ্য ভক্তিই প্রেম বা প্রীতি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। এই প্রেম বা প্রীতির স্বরূপ, প্রীতিসন্দর্ভেই বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। সেই প্রীতিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চরম বা পরম পুরুষার্থ। ইহাকেই পঞ্চম (অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের পরবর্ত্তী সর্ব্বোৎকৃষ্ট) পুরুষার্থ বলিয়া তিনি ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন।

এই সকল সিদ্ধান্তকে ব্যবস্থাপিত করিবার জন্য তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতকেই প্রধানতম প্রমাণ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীভগবত্তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইলে শ্রীমদ্-ভাগবতকেই প্রধানতম প্রমাণ বলিয়া কেন মানিতে হইবে, তাহার অনুকূল প্রমাণ ও যুক্তিনিবহ তিনি তত্ত্বসন্দর্ভ নামক প্রথম ভাগে প্রদর্শন করিয়াছেন:

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

এই ভাগবতোক্ত শ্লোকটীতে যে অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই দার্শনিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক শ্রীজীব গোস্বামী যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা এইরূপ, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিনটী শব্দ একমাত্র অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বেরই নামান্তর। সেই অখণ্ড চিদানন্দ স্বরূপ তত্ত্বই পৃথক পৃথক সাধন ভূমিতে অবস্থিত—

পৃথক্ পৃথক্ সাধকের দৃষ্টি ভেদানুসারে, পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতিভাসমান হইলেও বস্তুতঃ তাহা একই বস্তু। দ্রষ্টার দৃষ্টিভেদ-অনুসারে নানারূপে প্রতিভাসমান হইলেও বস্তুতঃ বস্তু ভিন্ন হয় না এবং একই বলিয়া লোকে পরিগৃহীতও হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ স্বরূপে শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন—

"দৃষ্টান্তশ্চ যথৈকমেব পট্টবস্ত্রবিশেষপিঞ্ছাবয়ববিশেষাদি দ্রব্যং নানাবর্ণময়প্রধানৈকবর্ণমপি কুতশ্চিৎ স্থানবিশেষাদ্ দত্তচক্ষুর্যোজনস্য কেনাপি বর্ণবিশেষণ প্রতিভাতীতি। অত্রাখণ্ডপট্টবস্ত্রবিশেষস্থানীয়ং নিজপ্রধানভাসান্তর্ভাবিত তত্তদ্রূপান্তরং শ্রীকৃষ্ণরূপং, তত্তদ্ বর্ণচ্ছবিস্থানীয়ানি রূপান্তরাণীতি জ্ঞেয়ম্। যথা শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে—

"মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ" ॥
মণিরত্র বৈদূর্য্যং নীলপীতাদয়স্তদ্‌গুণাঃ।

(ভাগবতসন্দর্ভে ভগবৎ সন্দর্ভ)

ইহার অর্থ—দৃষ্টান্তও যেমন (ময়ুরকণ্ঠি শাড়ী নামে প্রসিদ্ধ) কোন পট্টবস্ত্র ময়ুরের পিঞ্ছাদিরূপ নানাপ্রকার অবয়ব বিশেষের সমবায়ে বিরচিত একটী দ্রব্য, অর্থাৎ একখানি বস্ত্রই হয়, অথচ কোন স্থান বিশেষ হইতে কোন কোন ব্যক্তি তাহা যখন দেখে, তখন তাহা একের নিকটে যেরূপ বর্ণযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয়, অপর স্থান হইতে দ্রষ্টা অন্য লোকের নিকট তাহাই কিন্তু, অন্যপ্রকার বর্ণসমন্বিত বলিয়াই প্রতীত হয়। অথচ নানা বর্ণযুক্ত বলিয়া প্রতীত ঐ পট্টবস্ত্র বিশেষ, নানা বর্ণময় হইলেও প্রধান যে এক প্রকার বর্ণ বিশেষ, তাহাই

তাহার প্রধান বর্ণ হয় এবং সর্ব্বাংশে সেই প্রধান বর্ণ বিশিষ্ট একখানি বস্ত্র বলিয়াই লোকে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অথচ সেই প্রধান বর্ণের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ সকলও প্রবিষ্ট হয়। প্রকৃত স্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ পট্টবস্ত্র বিশেষ স্থানীয়, তাঁহার নিজ প্রধান বর্ণের প্রভার মধ্যেই তত্তদ্বর্ণের প্রভা অন্তর্ভাবিত হয়। সুতরাং অন্তর্ভাবিত সকল রূপান্তর তাঁহার যে প্রধান বর্ণ, তাহাই তাঁহার রূপ, রূপান্তর সমূহ—উক্ত ময়ূরকণ্ঠী শাড়ীতে নানাপ্রভায় পরিস্ফুরিত রূপান্তরসমূহেরই স্থলাভিষিক্ত, এইরূপই বুঝিতে হইবে। নারদ পঞ্চরাত্রেও ইহাই প্রকারান্তরে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"মণি যেমন বিভক্তভাবে নীলপীতাদি বর্ণযুক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ ধ্যানভেদবশতঃ অচ্যুত (শ্রীহরি) ও রূপ-ভেদকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

এই শ্লোকে যে মণির উল্লেখ আছে, তাহা বৈদূর্য্য (নামের প্রসিদ্ধ মণিবিশেষ) তাহার গুণ নীল, পীত প্রভৃতি, আচার্য্য শঙ্করের জীব ব্রহ্মৈক্যপর অদ্বৈতবাদ উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইরূপ আচার্য্য রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ প্রভৃতিও উপনিষদেরই উপরই প্রতিষ্ঠিত। এইভাবে তত্তৎ সম্প্রদায়ের সকল আচার্য্যগণই নিজ নিজ সম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তকে ঔপনিষদ সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচার করিতে কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করেন না, ইহা ভারতীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ সকলেই জানেন। অথচ উপনিষৎসমূহের মধ্যে এমন অনেক বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা দেখিলে মনে হয় ঐ সকল বাক্য—ব্রহ্ম যে নির্গুণ, নিরাকার, সচ্চিদানন্দাত্মক, সজাতীয়, বিজাতীয়, ও স্বগত ভেদ বর্জ্জিত, একমাত্র ও পরমাৎ

তত্ত্ব ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে। অন্যদিকে উপনিষদের এমন বহুতর বাক্যও রহিয়াছে, যাহা দেখিলে মনে হয়, ঐ সকল বাক্য ব্রহ্মকে সগুণ-সাকার অথচ জীব হইতে ভিন্ন বলিয়াই প্রতিপাদন করিতেছে। অদ্বৈতবাদীগণ এই প্রকার পরস্পর-বিরুদ্ধ উপনিষদ্-বাক্যসমূহের মধ্যে নির্গুণ-পর বাক্যগুলিরই পারমার্থিক প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া, সগুণ ব্রহ্মবোধক বাক্যগুলিকে ব্যবহারিক প্রমাণরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং তাহা করিতে গিয়া ফলতঃ সগুণ ব্রহ্ম-বোধক উপনিষদ-বাক্যগুলিকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছেন। অন্যদিকে সগুণ ব্রহ্মবাদী দার্শনিক আচার্য্যগণ সগুণ ব্রহ্ম-বোধক উপনিষদ্-বাক্যগুলিকেই বাস্তব প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং নির্গুণবোধক বাক্যসমূহকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছেন। এই প্রকারে নিজ নিজ মতের অভ্রান্ততা রক্ষা করিবার জন্য, শ্রুতিসমূহকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একভাগের প্রবলতা ও অপরভাগের দুর্ব্বলতাকল্পনা কিন্তু, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্য গোস্বামীদিগের সর্ব্বথা অনভিপ্রেত। তাঁহাদের মতে শ্রুতিমাত্রই ভগবদ্ বাক্য, সেই শ্রুতির মধ্যে কোনটি বাস্তব প্রমাণ আর কোনটী প্রমাণাভাস, ইহা মানুষের বুদ্ধি দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে না এবং এরূপ হওয়াও উচিত নহে। যাহা অন্য কোন প্রকার লৌকিক প্রমাণের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না, নিজ সেই স্বরূপকেই বুঝাইবার জন্য ভগবানই শ্রুতিরূপে জগৎস্রষ্টা আদিপুরুষের বুদ্ধিতে প্রকাশ পাইয়াছেন। সেই শ্রুতি—তাঁহারই স্বরূপ-প্রকাশ করিয়া থাকে এবং তাঁহারই রচিত, এই শ্রুতির—মধ্যে প্রবল দুর্ব্বল ভাবের কল্পনা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের

পরিচায়ক হইতে পারে। কিন্তু, তাহা স্বতঃপ্রমাণ শ্রুতির প্রতি শ্রদ্ধা ও গৌরব বুদ্ধির পরিচায়ক হইতে পারে না, ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুখ্য সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্তই হইল ইহার অন্যতম অবধারণীয় বৈশিষ্ট্য। ইহা শ্রীজীব গোস্বামী ভাগবত সন্দর্ভে অতি স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত যে শ্রীগৌরাঙ্গদেবেরও অভিমত, তাহা চৈতন্য চন্দ্রোদয় ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্বৈতবাদ বা নির্গুণ ব্রহ্মবাদ অবলম্বনে বেদান্তসূত্রের শঙ্করভাষ্যের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত সার্ব্বভৌমের প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গদেবেরও উক্তি, যথা—

"প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনার অর্থে তাহা কর আচ্ছাদন॥
উপনিষদ্ শব্দের মুখ্য অর্থ যেই হয়।
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাস-সূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধা বৃত্তি ছাড়ি, শব্দের করহ লক্ষণা॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যেই অর্থ কহে, সেই সে প্রমাণ॥

(……মধ্য খণ্ড ৬ পরিচ্ছেদ)

একই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বলিয়া অভিহিত হয়। দ্রষ্টার দৃষ্টিভেদবশতঃ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্

পৃথকরূপে প্রতিভাসমান হইলেও বস্তুতঃ এই অদ্বয় জ্ঞান একই বস্তু। এই শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তকে প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা ব্যবস্থাপিত করিবার জন্যই শ্রীজীবগোস্বামী ভাগবত সন্দর্ভ বা ষট্সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন। ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত। ভক্তিসন্দর্ভে ও প্রীতিসন্দর্ভে সাধনভক্তি ও প্রেম ভক্তি বিষয়ে তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই শ্রীসনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামীর বৃহদ্ ভাগবতামৃত, ভাগবতটীকাবৈষ্ণবতোষিণী এবং ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু প্রভৃতিতেও লিখিত হইয়াছে। কিন্তু, ভাগবত সন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামী অনুকূল যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা সর্ব্বাংশে সঙ্গতি রাখিয়া যেমন সুন্দরভাবে ঐসকল বিষয় সাজাইয়াছেন, তেমনটী অন্য কোন সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভক্তি গ্রন্থে দেখা যায় না।

প্রেম বা প্রীতির দার্শনিক দৃষ্টিতে কি প্রকার লক্ষণ হইতে পারে এবং শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর সহিত প্রীতির সম্বন্ধ কি? ইহা বুঝাইবার জন্য শ্রীজীব গোস্বামী যে সর্ব্বাংশে সফল ও বিশেষ প্রযত্ন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয় ও বিশেষ পাণ্ডিত্যসূচক হইলেও ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুই যে এই বিষয়ে তাঁহার প্রধানতম উপজীব্য, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বিদিত আছেন।

শ্রীভগবান্ ও প্রেম এই দুইটী বিষয়ই যে তাঁহার গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য তাহা শ্রীজীবগোস্বামী ভাগবত সন্দর্ভের অবতরণিকার শেষভাগে দুইটী শ্লোক দ্বারা স্পষ্ট ভাবেই জানাইয়াছেন।

যথা—"অথ নত্বা মন্ত্রগুরূন গুরূন্ ভাগবতার্থদান্ ।
শ্রীভাগবত সন্দর্ভং সন্দর্ভং বশ্মিলেখিতুম্ ॥৭ ॥
"যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞা ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তাঽ
প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ ।
একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যম্
সশ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তদ্‌পাদভাজাম্ ॥৮

অনন্তর দীক্ষাগুরু এবং ভাগবতের অর্থদাতা গুরুগণের চরণে নমস্কার করিয়া, আমি ভাগবত সন্দর্ভ নামক এই গ্রন্থ লিখিতে ইচ্ছা কবিতেছি ॥৭॥

কোন কোন শ্রুতিতে যাঁহার চিন্মাত্র সত্তাই 'ব্রহ্ম' এই সংজ্ঞাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহার অংশস্বরূপ পুরুষ নিজ অংশ-সমূহের দ্বারা মায়াকে বশীভূত করিয়া লীলাবতারসমূহকে প্রকটিত করেন; পরম ব্যোমে যাঁহার এক নারায়ণ নামে প্রথিতরূপ বিলাস করিয়া থাকে, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পাদপদ্মভজনকারীদিগের প্রেম বিধান করুন ॥৮॥

শ্রীমদ্ ভাগবতে এই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের তিন প্রকার নির্দ্দেশ থাকিলেও পবমাত্মা ও ভগবান্ এই দুইটী শব্দেরই অর্থ নিরূপণ কবিবার জন্য শ্রীজীবগোস্বামী দুইটী সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। একটীর নাম পবমাত্ম সন্দর্ভ, আর একটীর নাম ভগবৎসন্দর্ভ। কিন্তু ব্রহ্মসন্দর্ভ নামে কোন সন্দর্ভ তিনি পৃথগ্‌ভাবে লিখেন নাই; ইহার কারণ কি? তাহা শ্রীজীব-গোস্বামীপাদ নিজেই একটী শ্লোক দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

"ব্যঞ্জিতে ভগবত্তত্ত্বে ব্রহ্ম চ ব্যজ্যতে স্বয়ম্ ।
অত্রোঽত্র ব্রহ্মসন্দর্ভোঽপবান্তরতয়া মতঃ ॥"

ভগবত্তত্ত্ব কি? তাহা প্রকাশিত হইলে, ব্রহ্মতত্ত্বও স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া যায়, এই কারণে এই গ্রন্থে ব্রহ্মসন্দর্ভ অবান্তর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। তাই ব্রহ্মসন্দর্ভ পৃথগ্‌ভাবে লিখিত হয় নাই। আবার কাহারও মত এইরূপ যে, ব্রহ্মতত্ত্ব সবিশেষ পূর্ণ ভগবানেরই প্রভাস্থানীয়, ভগবৎসন্দর্ভে যখন শ্রীভগবানের স্বরূপ বিস্তৃতরূপে নির্ণয় করা হইয়াছে, তখন পৃথগ্‌ভাবে ব্রহ্মতত্ত্বের নিরূপণ বিষয়ে আকাঙ্ক্ষারই উদয় হইতে পারে না বলিয়াই, ব্রহ্মসন্দর্ভ পৃথক করিয়া লিখিবার আবশ্যকতা নাই। এই দ্বিবিধ উত্তরই সাম্প্রদায়িক হইলেও তেমন যুক্তি-সহ নহে; অদ্বৈতবাদিসম্প্রদায়ে ব্রহ্মতত্ত্বের সুপ্রসিদ্ধিই যদি পৃথক্ ব্রহ্মসন্দর্ভ না লেখার কারণ হয়, তাহা হইলে ঐ একই হেতুবশতঃ পরমাত্মা বা অন্তর্যামী পুরুষেরও তত্ত্ব ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্য ও বৃহদারণ্যকশাঙ্করভাষ্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাদ গ্রন্থেও প্রচুর ভাবে আলোচিত হইয়াছে, অথচ অদ্বৈতবাদীর অঙ্গীকৃত পরমাত্মতত্ত্ব হইতে ভাগবত সন্দর্ভের ব্যাখ্যাত পরমাত্মতত্ত্বের বস্তুতঃ বৈলক্ষণ্য না থাকায়, ব্রহ্ম সিদ্ধান্তের ন্যায় পরমাত্ম সন্দর্ভের পৃথক রচনাও অনাবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং প্রথম হেতুটী সন্তোষ-জনক নহে, দ্বিতীয় হেতুটী তথৈবচ, কারণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎ পূর্ণ-ভগবানের অধীন বা অংশ বা প্রভাস্থানীয় বলিয়া যদি ব্রহ্ম-সন্দর্ভের পৃথক প্রণয়ন অনাবশ্যক হয়, তবে অন্তর্যামী পরমাত্মা পুরুষও সেই সাক্ষাৎ পূর্ণ ভগবানেরই অংশ বলিয়া তাহার জন্যও পৃথক সন্দর্ভ রচনা অনাবশ্যক না হইবে কেন? সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দুইটী হেতুর কোনটীই পৃথক্ ব্রহ্মসন্দর্ভ না লিখিবার সম্পূর্ণ কারণ হইতে পারে না। পৃথক্

সন্দর্ভের দ্বারা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বের নিরূপণ না করিবার আরও একটী নিগূঢ় হেতু এই যে, নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি—এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য প্রেমলক্ষণা ভক্তির বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়সম্মত পঞ্চম পুরুষার্থের অনুকূল নহে, প্রত্যুত প্রতিকূলই হইয়া থাকে। হ্লাদিনীর সারভূত প্রেমের অভিব্যঞ্জক যে মনোবৃত্তি, তাহার সহিত নিরস্ত সমস্তভেদ চিন্মাত্র-সত্তারূপ ব্রহ্মপ্রকাশের উপজীব্যোপজীবক ভাবরূপ সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে। ইহাই ভাগবতসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী বুঝাইবার জন্য বিশেষ প্রযত্ন করিয়াছেন, এই কারণেই পৃথক্‌ভাবে ব্রহ্মসন্দর্ভ ভাগবতসন্দর্ভে স্থান পায় নাই।

অপ্রাকৃত অনন্তগুণাধার সর্ব্বজীবের কমনীয় নিরবধি আনন্দস্বরূপ যে ভগবান্, তাঁহার প্রকাশ এবং সেই ভগবানেরই বৈভবাংশস্বরূপ পরমাত্মার প্রকাশ ও প্রেমলক্ষণ ভক্তির সর্ব্বথা অনুকূল। তাই ভগবৎসন্দর্ভ ও পরমাত্মসন্দর্ভ ভাগবতসন্দর্ভে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে; ইহা প্রত্যেক ভাগবত সন্দর্ভানুশীলনকারীর স্মরণ রাখা উচিত। ইহা অগ্রে আলোচিত হইবে।

এক অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কি ভাবে পৃথক্ পৃথক্ আকারে প্রকাশিত হয় এবং পৃথক্ পৃথক্ পদ দ্বারা অভিহিত হইতে পারে, তাহাই বুঝাইবার জন্য শ্রীজীবগোস্বামী ভগবৎ সন্দর্ভে বলিয়াছেন, "অত্রেয়ং প্রক্রিয়া—একমেব তৎপরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব, প্রধান রূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে। সূর্য্যান্তমর্ণ্ডলে তেজইব মণ্ডল তদ্বহির্গতরশ্মি প্রতিচ্ছবিরূপেণ। এব মেব শ্রীবিষ্ণু পুরাণে

"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥"
"যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতী"তি শ্রুতেঃ।

অত্র ব্যাপকত্বাদিনা তত্তৎসমাবেশাদ্যনুপপত্তিশ্চ শক্তে রচিন্ত্যত্বেনৈব পরিহৃতা, দুর্ঘটঘটকত্বং হি অচিন্ত্যত্বম্।"

এ স্থলে এই প্রকার প্রক্রিয়া। একই সেই পরমতত্ত্ব স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা সকল সময়েই স্বরূপ, তদ্রূপ বৈভব, জীব ও প্রধানরূপে চারিপ্রকারে অবস্থান করেন। সূর্য্যমণ্ডলের অন্তবর্ত্তী তেজ—যেমন মণ্ডল, বহির্গতকিরণ এবং তাহার প্রতিচ্ছবি—এই চারিপ্রকারে অবস্থিত হয়। প্রকৃত স্থলে সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহাই বিষ্ণুপুরাণেও অভিহিত হইয়াছে।

যথা—"একদেশস্থিত অগ্নির প্রভা যেমন বিস্তারিণী হয়, সেইরূপ পরব্রহ্মের শক্তিও এই অখিল জগৎ স্বরূপে বিস্তার পাইয়া থাকে॥"

শ্রুতিও বলিয়া থাকে "যাঁহার প্রভায় এই অখিল বিশ্ব প্রভান্বিত হয়" এই স্থলে সেই পরমতত্ত্বের ব্যাপকতাদি বশতঃ এইরূপ সমাবেশ উৎপন্ন হইতে পারে না, এই প্রকার শঙ্কা ও তাঁহার শক্তির অচিন্ত্যতা দ্বারাই নিরাকৃত হইয়া থাকে। কারণ, দুর্ঘট ঘটকত্বই শক্তির অচিন্ত্যত্ব।

ইহার পরেই জীব গোস্বামী বলিয়াছেন, "শক্তিশ্চসাত্রিধা অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থাচ। তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভবরূপেণ চ তদব-তিষ্ঠতে। তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয়চিদেকাত্ম-শুদ্ধ-জীবরূপেণ,

বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া প্রতিচ্ছবিগতবর্ণশাবল্যস্থানীয়তদীয় বহিরঙ্গবৈভব জড়াত্ম প্রধান রূপেণ চেতি চতুর্দ্ধাত্বম্" ॥

সেই শক্তিও তিন প্রকার, অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। এই তিনটী শক্তির মধ্যে অন্তরঙ্গা শক্তির আর একটী নাম স্বরূপ শক্তি, সেই শক্তির দ্বারা শ্রীভগবান্ নিজ পূর্ণ-স্বরূপে এবং বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপ বৈভবরূপে অবস্থান করেন; তটস্থা শক্তির দ্বারা কিরণস্থানীয় চিন্মাত্রস্বরূপ শুদ্ধজীবরূপে অবস্থান করেন এবং বহিরঙ্গ মায়া শক্তিদ্বারা প্রতিচ্ছবিগত যে বর্ণশবলতা (নানাবর্ণতা), তৎস্থলাভিষিক্ত বহিরঙ্গবৈভব-স্বরূপ জড়াত্মক প্রধানাদিরূপে অবস্থান করেন। এইভাবে তাঁহার চতুর্বিধত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন হয়, এই শক্তিত্রয় সেই পরতত্ত্বেরই স্বরূপ অথবা ইহা তাহা হইতে ভিন্ন? যদি ভিন্নই হয়, তবে পরতত্ত্বের সহিত এই শক্তিত্রয়ের সম্বন্ধই বা কি প্রকার? এই প্রশ্নের সমাধান প্রসঙ্গে ভগবৎসন্দর্ভে এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

"শক্তেরচিন্ত্যত্বং স্বাভাবিকত্বঞ্চোক্তং" শ্রীবিষ্ণু পুরাণে—

"নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ

কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে ॥" ইতি মৈত্রেয় প্রশ্নানন্তরং শ্রীপরাশর উবাচ—

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।

যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।

ভবন্তিতপতাংশ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥"

অত্র শ্রীধর স্বামিকৃত টীকা চ—

"তদেবং ব্রহ্মণঃ সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বমুক্তং। তত্র শঙ্কতে, নির্গুণস্যেতি সত্ত্বাদিগুণরহিতস্য, অপ্রমেয়স্য দেশকালাদ্য

পরিচ্ছিন্নস্য, শুদ্ধস্য অদেহস্য সহকারিশূন্যস্যেতিবা, অমলাত্মনঃ পুণ্যপাপসংস্কারশূন্যস্য রাগাদিশূন্যস্যেতিবা। এবম্ভূতস্য ব্রহ্মণঃ কথং সর্গাদিকর্তৃত্বমিষ্যতে, তদ্বিলক্ষণস্যৈব লোকে ঘটাদিষু কর্তৃত্বদর্শনাদিত্যর্থঃ। পরিহরতি শক্তয় ইতি সার্দ্ধেন। লোকেহি সর্ব্বেষাং ভাবানাং মণিমন্ত্রাদীনাং শক্তয়ঃ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ। অচিন্ত্যং তর্কাসহং যজ্‌জ্ঞানং কার্য্যান্যথানুপপত্তিপ্রমাণকং তস্য গোচরাঃ সন্তি। যদ্বা অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদি বিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ কেবল মর্থাপত্তিজ্ঞানগোচরাঃসন্তি। যতএবং অতো ব্রহ্মণোঽপি তাস্তথাবিধাঃ শক্তয়ঃ সর্গাদিহেতুভূতা ভাবশক্তয়ঃ স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। পাবকস্য দাহাদিশক্তিবৎ। অতো গুণাদিহীনস্যাপি অচিন্ত্যশক্তিমত্ত্বাৎ ব্রহ্মণঃ সর্গাদি কর্তৃত্বং ঘটত ইত্যর্থঃ” ॥

উদ্ধৃত গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই—শক্তির অচিন্ত্যত্ব ও স্বাভাবিকত্ব বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে,—যথা, যাহা নির্গুণ, যাহা অপ্রমেয়, যাহা শুদ্ধ ও যাহা অমলাত্মা, সেই ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টি প্রভৃতির প্রতি কর্তৃত্ব কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? এইপ্রকার মৈত্রেয় ঋষির প্রশ্নে পরাশর বলিলেন, সকল ভাববস্তুরই যে শক্তিসমূহ আছে, তাহা অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরই হয়, এই কারণে ব্রহ্মে যে জগৎসৃষ্টি প্রভৃতির অনুকূল ভাবশক্তিসমূহ আছে, তাহাও অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর, হে তাপসশ্রেষ্ঠ, অগ্নির উষ্ণতা অর্থাৎ দাহিকাশক্তির ন্যায়ই তাহা বুঝিতে হইবে। বিষ্ণুপুরাণের এই উদ্ধৃত অংশের শ্রীধর স্বামী এইরূপ টীকা করিয়াছেন। এই প্রকারে ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টি প্রভৃতির প্রতি যে কর্তৃত্ব বলা হইয়াছে, তাহার উপর শঙ্কা

করা হইতেছে নিগুর্ণস্থ ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা, এখানে নির্গুণ শব্দের অর্থ সত্ত্বাদিপ্রাকৃতগুণরহিত, অপ্রমেয় শব্দের অর্থ দেশ ও কালাদিদ্বারা অপরিচ্ছন্ন।

শুদ্ধ শব্দের অর্থ দেহরহিত। অথবা শুদ্ধ শব্দের অর্থ সহকারিশূন্য। অমলাত্মা এই শব্দটীর অর্থ পুণ্য-পাপ-সংস্কার-রহিত অথবা রাগাদি-দোষরহিত। এই প্রকার লক্ষণ-সমন্বিত ব্রহ্মের কি প্রকারে সৃষ্টাদিকর্ত্তৃত্ব সম্ভবপর হইবে? কারণ, লৌকে এতদ্‌বিলক্ষণ বস্তুরই ঘটাদিবস্তুনির্ম্মাণে কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই শঙ্কার সমাধান করিতেছেন, সার্দ্ধশ্লোক দ্বারা। যথা, লোকে মণিমন্ত্র প্রভৃতি সকল ভাব-বস্তুর যে শক্তিসমূহ আছে, তাহা সকলই অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। অচিন্ত্য শব্দের অর্থ তর্কাসহ যে জ্ঞান, তহাই, অর্থাৎ কোন প্রসিদ্ধ কার্য্যের অন্যথা উপপত্তি না হওয়া রূপ যে অর্থাপত্তি প্রমাণ, সেই প্রমাণের দ্বারা যেজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানের যাহা গোচর, তাহাই অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর। এই পদটীর এরূপ অর্থও হইতে পারে, যথা, অচিন্ত্য' অর্থাৎ ইহা ভিন্ন বা অভিন্ন এই প্রকার যে সকল বিকল্প, তাহা দ্বারা যাহা চিন্তিত হইতে পারে না, তাহাই অচিন্ত্য শব্দের অর্থ। ইহারও তাৎপর্য্যার্থ এই যে, কোন প্রমাণসিদ্ধ কার্যের অন্য কোন প্রকারে উপপত্তি হয় না বলিয়া অগত্যা যে জ্ঞান হইয়া থাকে, সেই প্রকার জ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহাকেই অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর বলা যায়; প্রত্যেক ভাববস্তুতে যে শক্তি আছে তাহাই অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। যেহেতু শক্তি মাত্রেরই এই প্রকার স্বভাব লোকসিদ্ধ, এই কারণে ব্রহ্মে যে সকল শক্তি আছে, তাহা

সকলই অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর। সুতরাং সেই শক্তিসমূহ বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতির হেতু হইয়া থাকে এবং সে সকলই স্বভাব সিদ্ধ। এই প্রকার স্বভাবের ভাবশক্তিসমূহ—অগ্নিতে দাহিকাশক্তির ন্যায় ব্রহ্মে স্বভাবতঃ বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহাই মানিতেই হইবে। সুতরাং অচিন্ত্য শক্তিমান্ বলিয়া ব্রহ্মের জগৎসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বও সিদ্ধ হইতেছে।

উল্লিখিত ভাগবত সন্দর্ভে জীবগোস্বামী অতি স্পষ্টভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সর্ব্বজনসম্মত অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তই ব্যবস্থাপন করিয়াছেন, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপ পরব্রহ্ম অদ্বিতীয় হইয়াও অনন্ত শক্তির আধার, এই শক্তিসমূহ ভেদাসহ অভেদবাদীর বা অভেদাসহ ভেদবাদীর মতানুসারে অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন ইহা নির্ণীত হইতে পারে না। অগ্নি দাহ করে বলিয়া তাহাকে দাহক বলা যায় কিন্তু, দাহ্য বস্তু যখন না থাকে, তখন অগ্নি অগ্নিই থাকে তাহা দাহক বলিয়া ব্যবহৃত হয় না, সুতরাং দাহিকাশক্তি ও অগ্নি এই দুইটীর পরস্পর সম্বন্ধ আধারাধেয় ভাবরূপ ভেদ, অথবা স্বরূপ বা তাদাত্ম্য বা অভেদরূপ সম্বন্ধ, তাহা এপর্য্যন্ত কেহই বিচার করিয়া স্থির করিতে পারে নাই। কখনও যে কেহ নির্ণয় করিতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনাও নাই বলিলে মিথ্যোক্তি বা অত্যুক্তি হয় না। সকল দার্শনিকের—বিশেষতঃ শিক্ষিত ও তত্ত্বান্বেষণপর বাঙ্গালী মাত্রেরই অচিন্ত্যজ্ঞান গোচর শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের প্রতি প্রণিধান একান্ত আবশ্যক, কিছুকাল হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ইহা নিম্বার্কসম্প্রদায়ের অন্তর্গত। অন্যদিকে আরও

একটী মতও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহা শ্রীরামানুজ সম্প্রদায় সিদ্ধ দার্শনিক মতানুযায়ী। কেহ কেহ আবার ইহাকে মধ্বস্বামীর মতানুযায়ী বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না।

প্রকৃত পক্ষে কিন্তু, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আদেশ ও মতেরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে, ইহা মাধ্ব বা রামানুজ কিম্বা বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি কোন বৈষ্ণবাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত বা শাখা নহে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একমাত্র উপাস্য শ্রীভগবানের স্বরূপ ও বৈভবাদি তত্ত্ব ও প্রভাবাদি বিষয়ে কোন লৌকিক প্রমাণই আদরণীয় নহে, কোন আচার্য্যের বেদানন্নুমোদিত বচনও গ্রাহ্য নহে—একথা তত্ত্বসন্দর্ভের প্রথমেই শ্রীজীবগোস্বামী স্পষ্টভাবেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—

"অথৈবং সূচিতানাং শ্রীকৃষ্ণ তদ্বাচ্যবাচকতালক্ষণ সম্বন্ধ তদ্‌ভজনলক্ষণ বিধেয়সপর্য্যায়াভিধেয় তৎপ্রেম লক্ষণ প্রয়োজনাখ্যানামর্থানাং নির্ণয়ায় তাবৎ প্রমাণং নির্ণীয়তে। তত্র পুরুষস্য ভ্রমাদি দোষ চতুষ্টয়দুষ্টত্বাৎ সুতরামলৌকিকাচিন্ত্যস্বভাববস্তুস্পর্শাযোগ্যত্বাৎ চ তৎ প্রত্যক্ষাদীনি অপি সদোষাণি। ততস্তানি ন প্রমাণানীতি অনাদিসিদ্ধি সর্ব্বপুরুষ পরম্পরাসু সর্ব্বলৌকিকালৌকিকজ্ঞাননিদানত্বাৎ অপ্রাকৃতবচন লক্ষণোবেদ এবাস্মাকং সর্ব্বাতীতসর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাচিন্ত্যাশ্চর্য্য-স্বভাবং বস্তু বিবিদিষতাং প্রমাণম্"।

ইহার অর্থ যথা, "পূর্ব্বে অবতরণ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ, (গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়) তাঁহার সহিত গ্রন্থের বাচ্যবাচকলক্ষণ সম্বন্ধ, তাঁহার শ্রবণকীর্ত্তনাদিভজনরূপ বিধেয়নামক

অভিধেয়, এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরূপ প্রয়োজন, এই চারিটী অর্থ সূচিত হইয়াছে, তাহাদের স্বরূপনির্ণয়ের অনুকূল প্রমাণ কি? তাহাই অনন্তর নির্ণীত হইতেছে। পুরুষমাত্রই ভ্রমাদিচতুর্ব্বিধদোষের দ্বারা দুষ্ট হয়, সুতরাং অলৌকিক ও অচিন্ত্যস্বভাব বস্তুর সহিত সংস্পর্শ নাই বলিয়া, তাহার প্রত্যক্ষাদি ও সদোষ। এই কারণে উক্ত বিষয়ে তাহা প্রমাণ হইতে পারে না।

এই হেতু সর্ব্বপুরুষ পরম্পরা সমূহে সকল প্রকার লৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের মূল কারণ হয় বলিয়া, অপ্রাকৃত বচন স্বরূপ যে অনাদি সিদ্ধ বেদ, তাহাই আমাদের প্রমাণ, কারণ আমরা-সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাচিন্ত্য, অথচ আশ্চর্য্য স্বভাব যে বস্তু, তাহাকেই জানিতে চাহি।"

ইহার পরেই শ্রীজীবগোস্বামী বিচার ও প্রমাণের দ্বারা ইহাই সিদ্ধ করিয়াছেন যে,—পুরাণ, মহাভারতাদি ইতিহাস ও বেদেরই অন্তর্গত, এই কারণে পুরাণ ও ইতিহাস এই সকল বিষয়ে গৌড়ীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রমাণ রূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে, সেই পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তত্ত্বসন্দর্ভে তিনি বিশেষ গৌরবের সহিত মধ্বাচার্য্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা সত্য, কিন্তু, কেবল মধ্বাচার্য্যেরই নাম তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি একই প্রসঙ্গে শ্রীরামানুজাচার্য্যের, ভাগবত টীকাকার বিজয়ধ্বজের এবং ব্যাসতীর্থেরও নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রকার গৌরবের সহিত ইঁহাদের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় তত্তৎসম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইবে—এই প্রকার মত কখনই শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। উল্লিখিত আচার্য্যগণের

মধ্যে শ্রীরামানুজাচার্য্যের প্রতি "ভগবৎপাদ" এই বিশেষণের দ্বারা শ্রদ্ধা ও আদরাতিশয় তিনি দেখাইয়াছেন বলিয়া, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে রামানুজ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ইহাও কেহ স্বীকার করেন্ না এবং না করাই উচিত। নিজ সিদ্ধান্তের কোন এক অংশের সমর্থক বলিয়া, ভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যের মত প্রদর্শন, জীব গোস্বামী ভাগবত সন্দর্ভের অনেক স্থলেই করিয়াছেন, শুধু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্য-গণেরই মতই যে তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা নহে অদ্বৈত-বাদাচার্য্যেরও মত উদ্ধৃত করিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। যথা—

"তত্র মুক্তা অপিলীলয়া বিগ্রহং কৃত্বাভজন্ত" ইতি,
"যংসর্ব্বে দেবা আমনন্তি
মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ"॥ ইতি,
অত্রশ্রুতৌ অদ্বৈতবাদগুরবোঽপি"॥

"সকল দেবই যাঁহার স্তুতি করিয়া থাকেন এবং মুমুক্ষুও ব্রহ্মবাদীগণও এইরূপ করিয়া থাকেন" এইরূপ শ্রুতির ব্যাখ্যাবসরে অদ্বৈতবাদের গুরু (আচার্য্য শঙ্কর) ও বলিয়াছেন—মুক্ত পুরুষগণ ও লীলাবশতঃ শরীর গ্রহণ করিয়া (শ্রীভগবানকে) ভজনা করিয়া থাকেন।

আচার্য্য শঙ্করের এই প্রকার উক্তি স্বসিদ্ধান্তৈকদেশের্ সমর্থনের জন্যই উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া, শ্রীজীব গোস্বামী যেমন শাঙ্কর সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট হন্ না, সেইরূপ আচার্য্য রামানুজ বা মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণের মতও স্বসিদ্ধান্তৈকদেশের সমর্থনের জন্য উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া, জীব গোস্বামী, রামানুজ বা

মধ্বাচার্য্যের মতাবলম্বী বা তত্তৎসম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারেন না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্ব্বস্বীকৃত যে অচিন্ত্য ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত, তাহার কোন কোন অংশে মধ্বাচার্য্য বা রামানুজাচার্য্যের বেদানুগত সদ্‌যুক্তিপূর্ণ যে ব্যাখ্যা বা উক্তি, তাহাই ভাগবতসন্দর্ভে যথাস্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাই বলিয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় তত্তৎ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অর্থাৎ তদীয় শাখা বিশেষ, এইরূপ কুস্থষ্টি কল্পনা—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মূল পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রতিও যথেষ্ট শ্রদ্ধা বা ভক্তির পরিচায়ক নহে। ভূমিবিশেষে উপস্থিত ভিন্ন ভিন্ন সাধকের অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বাত্মক পরমাত্ম বস্তুর জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইলেও, ঐরূপ জ্ঞানের মধ্যে কোন জ্ঞানই কিন্তু, ভ্রান্তি নহে, অনন্ত শক্তিধর অনন্ত পুরুষের অনন্তাশ্চর্য্যময় স্বরূপের পরিপূর্ণ প্রকাশ বা অসম্পূর্ণ প্রকাশ কোনটীই অযথার্থ বা মিথ্যা জ্ঞান নহে। প্রত্যুত সকলপ্রকার প্রকাশই প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞান, এই জ্ঞানসমূহের মধ্যে পরস্পর বৈলক্ষণ্য বা তারতম্য থাকিলেও জ্ঞেয় যে অদ্বয় সচ্চিদানন্দাত্মক বস্তু, তাহার কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য হইতে পারে না, ইহাই জীব গোস্বামী ভগবৎ সন্দর্ভে স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—

"তত্রৈকমেব তত্ত্বং দ্বিধা শব্দ্যতে ইতি ন বস্তুনোভেদ উপপদ্যতে। আবির্ভাবস্যাপি ভেদদর্শনাৎ ন চ সংজ্ঞামাত্রং। কিন্তু সম্যগদর্শন যোগ্যতাভেদেন দ্বিবিধোঽধিকারী দ্বিধাদৃষ্টং তদুপাস্তে। ইতি। তত্রাপ্যেকস্য বাস্তবত্বমন্যস্য ভ্রমত্ব মিতি ন মন্তব্যম্ উভয়োরপি যাথার্থ্যেন দর্শিতত্বাৎ। নচৈকস্য

বস্তুনঃ শক্ত্যা বিক্রিয়মাণাংশকত্বাদংশতোভেদঃ বিকৃতত্ব নিষেধাত্তয়োঃ। তস্যা দৃষ্টেরসম্যক্ত্বাৎ সত্যপি সম্যক্ত্বে তদনমুসন্ধানাদ্বা একস্মিন্নধিকারিণি একদেশেন স্ফুরদেকভেদঃ পরস্মিন্ন খণ্ডতয়া দ্বিতীয়ো ভেদঃ। এবং সতি যত্র বিশেষং বিনৈব বস্তুনঃ স্ফূর্ত্তিঃ সা দৃষ্টিরসম্পূর্ণা যথা ব্রহ্মাকারেণ, যত্র স্বরূপভূতনানাবৈচিত্রীবিশেষবদাকারেণ, সা সম্পূর্ণা যথা শ্রীভগবদাকারেণ ইতি লভ্যতে"॥ (ভগবৎসন্দর্ভ)

এই অংশের তাৎপর্য্যার্থ এই—তাহাতে একই তত্ত্ব দুইটী শব্দের দ্বারা (অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং ভগবান্ এই দুইটী শব্দ দ্বারা) অভিহিত হয় মাত্র, তাহাতে বস্তুর ভেদ সিদ্ধ হয় না। আবির্ভাবেরই ভেদ দেখা যায়, কেবল যে সংজ্ঞা মাত্রেরই ভেদ, তাহা নহে কিন্তু, নিজনিজ দর্শনযোগ্যতার ভেদবশতঃ অধিকারী দুই ভাবে দেখিয়া সেই একই তত্ত্বের উপাসনা করিয়া থাকে। এই দ্বিবিধ দর্শনের মধ্যে একটী যথার্থ দর্শন অন্যটী ভ্রান্তি, এই প্রকার কল্পনা উচিত নহে। কারণ, দ্বিবিধ দর্শনেরই যে যথার্থতা আছে তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। এরূপ স্থলে একই বস্তু শক্তিবশতঃ কোন অংশে বিকার প্রাপ্ত হয় বলিয়া, তাহার অংশতঃ ভেদ হইবে এই প্রকার আশঙ্কাও হইতে পারে না, কারণ, সেই ব্রহ্ম ও ভগবান্ এই দুইএর কোনটীরই বিকার হয়—এই প্রকার কল্পনা শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং উক্ত দ্বিবিধ অধিকারীর মধ্যে কাহারও দৃষ্টি অসম্যক্ এবং কাহারও দৃষ্টি সম্যক্ (অর্থাৎ একের দৃষ্টি অসম্পূর্ণ অপরের দৃষ্টি সম্পূর্ণ) হয় বলিয়া, অথবা উভয় দৃষ্টির সম্যক্ত্ব থাকিলেও অধিকারী বিশেষের নিকট তাহার সম্যক্ত্বের অনুসন্ধান থাকে না বলিয়া, কোন অধিকারীর

নিকট সেই একমাত্র তত্ত্বের একটীমাত্র বিশেষ স্ফুরিত হইয়া থাকে। অন্য অধিকারীর নিকট তাহা (অর্থাৎ বিশেষ) অখণ্ডভাবেই স্ফুরিত হইয়া থাকে, এই মাত্র বিশেষ। ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হইল, তবে বিশেষ ব্যতিরেকে যে দৃষ্টিতে বস্তুর স্ফুর্ত্তি হয় সেই দৃষ্টিকে অসম্পূর্ণ বলা যায়, যেমন নিরাকার ব্রহ্মের স্ফূর্ত্তি। আর যে দৃষ্টিতে তাঁহার স্বরূপ ভূত নানা বৈচিত্রীযুক্তবিশেষ আকারেরও স্ফূর্ত্তি হয, তাহাই সম্পূর্ণ দৃষ্টি, যেমন শ্রীভগবদাকারে স্ফুর্ত্তি বা দৃষ্টি।

শ্রীভগবানের ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে তাঁহার স্বরূপ শক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তির স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামী ভাগবতসন্দর্ভে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষেপে যাহা সার, এক্ষণে তাহাই বলা হইতেছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অন্যথানুপপত্তি বা অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণের দ্বারা সকল প্রকার শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ ও ভেদ উভয়ই সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের যে স্বরূপ শক্তি ও তাহার ত্রৈবিধ্য, তাহাও অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণ দ্বারা সুতরাং সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই অর্থাপত্তি বা অন্যথানুপপত্তির পৃথক্ প্রামাণ্য আছে কি নাই, এই বিষয়ে দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। নৈয়ায়িক প্রভৃতি ভেদবাদী দার্শনিকগণ এই অর্থাপত্তিকে অনুমান প্রমাণেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন কিন্তু, বেদান্তী ও মীমাংসক নামে প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণ অর্থা-পত্তিকে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া, ইহার পৃথক্ প্রামাণ্যই অঙ্গীকার করেন। এই দ্বিবিধ দার্শনিক মতের মধ্যে কোনটি সম্যক্ আর কোনটী অসম্যক্, এই বিচারের অবসর ইহা নহে। কিন্তু ইহা স্থির যে ইহাঁরা সকলেই অর্থাপত্তির

প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং অর্থাপত্তিকে প্রমাণরূপে অঙ্গীকার করিয়া, শ্রীজীব গোস্বামী কোন আস্তিক দার্শনিকের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের প্রতি পক্ষপাত দেখাইয়াছেন, এরূপ কল্পনা আসিতেই পারে না।

এই অর্থাপত্তি প্রমাণ সম্বন্ধে এতটুকু বলা বোধ হয় প্রকৃতের অনুপযোগী হইবে না। প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ কোন কার্য্য বা সিদ্ধবস্তু যদি অনুপপন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, তবে তাহার সেই অনুপপন্নতার পরিহার করিবার জন্য যে বস্তু কল্পিত হইয়াছে বা হইয়া থাকে, সেই বস্তুকেই অর্থাপত্তি প্রমাণ সিদ্ধ বলা হয়। উদাহরণ, দেবদত্ত নামক কোন ব্যক্তি দিবসে কোন সময়েই কিছু খায় না অথচ সে রোগাও হয় না, বেশ হৃষ্টপুষ্টাঙ্গই থাকে, ইহা দেখিয়া আমরা যদি তাহার রাত্রিতে ভোজনের কল্পনা করি, তাহা হইলে, তাহার এই রাত্রি ভোজন অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণ দ্বারাই সিদ্ধ হয়। এখানে দেবদত্তের যে দিনে অভোজন ও পীনত্ব তাহা প্রমাণের অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ, এই জাতীয় প্রমাণ লৌকিকও হইতে পারে অলৌকিক অর্থাৎ স্বতঃপ্রমাণ বেদও হইতে পারে, লৌকিক প্রমাণের দ্বারা দিবসে দেবদত্তের অভোজন ও স্থূলত্ব তাহার রাত্রি ভোজন বিনা অনুপপন্ন হয় বলিয়া, এখানে এই অর্থাপত্তিকে দৃষ্টার্থাপত্তি বা সামান্যতঃ অর্থাপত্তি বলা যায়, কিন্তু আর এক প্রকার অর্থাপত্তি আছে, তাহার নাম শ্রুতার্থাপত্তি, স্বতঃপ্রমাণ বেদে যাহা প্রতিপাদিত হয়, অথচ তাহা আপাততঃ যদি অনুপপন্ন বলিয়া মনে হয়, তবে সেই অনুপপত্তি পরিহারের জন্য যে বস্তুর কল্পনা আবশ্যক হয়, সেই বস্তুকে শ্রুতার্থাপত্তি প্রমাণের বিষয় বলা যায়। এই প্রকার

শ্রুতার্থাপত্তি বেদপ্রতিপাদ্য অর্থেরই উপপাদন করে, বলিয়া, ইহা বেদসদৃশ প্রমাণ বলিয়া আস্তিকদার্শনিকগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে॥ বেদে আছে—যে স্বর্গকামনা করে, সে অগ্নিহোত্র যাগের অনুষ্ঠান করিবে, এইরূপ বেদবাক্য বলিয়াদেয়, স্বর্গরূপসুখের সাধন অগ্নিহোত্র যাগ। কিন্তু, আপাততঃ ইহা অনুপপন্ন বলিয়া মনে হয়, কারণ, কার্য্যের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে যাহা বিদ্যমান থাকে, তাহাকেই লোকে সাধন বলিয়া থাকে, যাঁগ কিন্তু, স্বর্গের এইরূপ সাধন ত হয় না, কারণ, ঠিক যাগানুষ্ঠানের পরক্ষণেই কেহ স্বর্গসুখের অধিকারী হয়, ইহা ত দেখা যায় না, অথচ বেদ অগ্নিহোত্র যাগকে স্বর্গের সাধন বলিতেছে, এই বেদাবগত অগ্নিহোত্রযাগে স্বর্গসাধনতার অনুপপত্তি পরিহার করিতে হইলে, বাধ্য হইয়া আমাদিগকে কল্পনা করিতে হয় যে,অগ্নিহোত্র যাগ করিবামাত্র আমাদের আত্মাতে এমন কোন বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয়, যাহা স্বর্গ সুখলাভের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণপর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। সেই গুণ বা পুণ্য সুতরাং শ্রুতার্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভাগবতসন্দর্ভে যে সকল অর্থাপত্তি প্রমাণের ,অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ এই প্রকার শ্রুতার্থাপত্তিই হইয়া থাকে। শ্রুতিও তন্মূলক অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা অনন্তশক্তিমদ্ ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ এই তিনটী শব্দের দ্বারা অভিধেয় সেই অদ্বয়তত্ত্বই উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র এবং ভগবদ্ গীতা প্রভৃতির একমাত্র প্রতিপাদ্য এবং সমগ্র শ্রীমদ্ ভাগবত দ্বারা এই অদ্বয়তত্ত্বেরই স্বরূপ এবং তাহার প্রতি প্রেমভক্তিই যে জীবের পঞ্চম বা চরম পুরুষার্থ, তাহা

সবিস্তারে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাই নিঃসন্দিগ্ধভাবে শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীভাগবতসন্দর্ভ গ্রন্থে প্রমাণানুগত বিচারের দ্বারা ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন, তিনি মধ্বাচার্য্যের যে অত্যন্ত ভেদ সিদ্ধান্ত তাহাও অবলম্বন করেন নাই, আবার আচার্য্য শঙ্করের ন্যায় আত্যন্তিক অভেদ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন নাই, অথচ তিনি অভেদ ও ভেদ এই দ্বিবিধ সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করিয়া অচিন্ত্য ভেদাভেদসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই অচিন্ত্য ভেদাভেদসিদ্ধান্তই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অসাধারণ সিদ্ধান্ত, এই গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত মাধ্ব সিদ্ধান্ত নহে,ইহা নিম্বার্ক সিদ্ধান্ত নহে, ইহা বিষ্ণু স্বামীর সিদ্ধান্ত নহে এবং ইহা আচার্য্য রামানুজেরও সিদ্ধান্ত নহে, ইহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের অসাধারণ সিদ্ধান্ত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবগোস্বামী এই সিদ্ধান্তকেই অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সুতরাং এই সিদ্ধান্ত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবপ্রবর্ত্তিত গৌড়ীয়বৈষ্ণব "সম্প্রদায়ের প্রত্যেক নিষ্ঠাবান্ ও আস্তিক ব্যক্তির যে অবশ্য অঙ্গীকরণীয়, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহের অবসর নাই। ভাগবতসন্দর্ভে তাই আচার্য্যপ্রবর শ্রীজীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন্।

"তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তিশক্তিমতোঃ পরস্পরানু প্রবেশাৎ শক্তিমদ্‌ব্যতিরেকেণ শক্তিব্যতিরেকাৎ চিত্তা বিশেষাচ্চ ক্বচিদভেদ নির্দ্দেশ একস্মিন্নপি বস্তুনি শক্তিবৈবিধ্য দর্শনাৎ ভেদনির্দ্দেশশ্চ নাসমঞ্জসঃ" ॥

(ভাগবত সন্দর্ভে পরমাত্ম সন্দর্ভঃ)

এই প্রকার (জীবাত্মারও পরব্রহ্মের) শক্তিরূপতা সিদ্ধ হইতেছে, সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পরানুপ্রবেশ বশতঃ এবং শক্তিমানের ব্যতিরেকে শক্তির ও ব্যতিরেক সিদ্ধ হয় বলিয়া, (শ্রুতিতে) কোন কোন স্থলে ভেদ নির্দ্দেশ হইয়াছে, আবার একই বস্তুতে শক্তিনিচয়ের নানাত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া এবং শক্তি ও শক্তিমানের চিদ্রূপতাবশতঃ (শ্রুতিতে) অভেদ নির্দ্দেশও দেখা যায়। এই কারণে ভেদ ও অভেদের নির্দ্দেশ আছে, এই উভয় নির্দ্দেশই অসংলগ্ন নহে।

তাই দেখিতে পাই চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ভক্তিস্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে ভক্তির পরমোৎকর্ষ বিষয়ে শ্রীরামানন্দ রায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্মুখে বলিতেছেন।

"অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূৎ
মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি তথা।
ভবান্ ভর্ত্তা ভার্য্যাঽহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতি
স্তথাপ্যস্মিন্ প্রাণঃ স্ফুরতি ননুচিত্রং কিমপরম্॥"

ইহা শ্রীরাধার দূতীমুখে মথুরায় রাজসিংহাসনে সমাসীন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উক্তই হইয়াছে। শ্লোকটীর অর্থ এই, সেই-কালে (যখন তোমার সহিত আমার ব্রজে মিলন হইয়াছিল তখন) আমি তোমার কান্তা, ও তুমি আমার কান্ত-এইপ্রকার বোধ ছিল না, মনের বৃত্তিও তখন লুপ্ত হইয়াছিল। তুমি ও আমি এই প্রকার ভেদজ্ঞানও তখন ছিল না। আজ তুমি ভর্ত্তা (প্রতিপালক) আর আমি তোমার ভার্য্যা (প্রতিপাল্য) এই প্রকার বোধ আবার উদিত হইয়াছে, এখনও যে এই দেহে প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে (রাধার জীবনে) ইহা অপেক্ষা

আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে? পরম ভক্ত শ্রীরামানন্দ রায়ের মুখে প্রেমভক্তির এই সর্ব্বোত্তম অবস্থার কথা শুনিয়া প্রেমভক্তির পরিপূর্ণ অবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি করিয়াছিলেন, তাহার যে অপূর্ব্ব ও মধুর দৃশ্য চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে কবিকর্ণপুর ফলাইয়াছেন, তাহাও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য দ্রষ্টব্য। তাহা এই

"ধৃতফণ ইব ভোগী গারুড়ীয়স্যগানং
তদুদিতমতিতৃপ্ত্যাকর্ণয়ন্ সাবধানঃ।
ব্যধিকরণতয়াবানন্দ—বৈবশ্যতো বা
প্রভুরপি করপদ্মেনাস্যমস্যাহ্প্যধত্ত॥"

ফণা ধরিয়া সর্প যেমন সাপুড়ের গান শুনিয়া থাকে, তেমনিই মহাপ্রভু অবহিত হইয়া অতি তৃপ্তির সহিত শ্রীরামানন্দ রায়ের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিলেন, তাহার পর—হয় এই উক্তির উপযুক্ত অবস্থা তখনও আসে নাই অথবা এই উক্তি শ্রবণে যে আনন্দ সমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত বিবশতার বশে, তিনি নিজ করপদ্ম দিয়া রামানন্দ রায়ের মুখকে আবৃত করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও এই প্রসঙ্গে রামানন্দ রায়ের মুখে এইরূপ উক্তিই শুনিতে পাওয়া যায় এবং ঐ উক্তিই তাঁহার প্রেমভক্তি তত্ত্বের শেষ কথা—

"পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল॥
না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি॥

এ সখি এসব প্রেম কাহিনী।
কানু ঠামে কহবি, বিছুরল জানি ॥
না খোঁজনু দূতী না খোঁজলুঁ আন্।
দুঁহু কেহি মিলনে মধত পঞ্চবান্॥
অবসো বিরাগ, তুহুঁ ভেল দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছনরীতি ॥"

এখন প্রকৃতের অনুসরণ করা যাক্।

মনে থাকে যেন, প্রেমভক্তিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে জীবের পঞ্চম বা চরম পুরুষার্থরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সেই প্রেমভক্তি শ্রীভগবানের অন্যতম স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিণতি। পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে— শ্রীভগবান্ অচিন্ত্যানন্ত শক্তির আধার, কারণ শ্রুতিই বলিতেছে

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"।

(ইহাঁর বিবিধ পরা শক্তি আছে ইহা শুনা যায়) শ্রীভগবানের অনন্ত অচিন্ত্য শক্তি সমূহের মধ্যে পরা অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা এই শক্তিত্রয়ের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে, তাঁহার স্বরূপ শক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি ত্রিধা বিভক্ত হইয়া থাকে। তাই বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়— তাঁহার স্বরূপ শক্তির এইরূপ বিভাগ করা হইয়াছে। যথা—

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে" ॥

(হে ভগবন্) তুমি যেহেতু সকলের আশ্রয়, এই কারণে, তোমাতে হ্লাদিনী সন্ধিনী এবং সংবিৎ এই তিনটী শক্তিও

আছে (কার্য্যানুরোধে হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সম্বিৎ এই পৃথক্ তিনটী শব্দের দ্বারা অভিহিত হইলেও) এই তিনটী শক্তিও বাস্তবপক্ষে এক (অর্থাৎ তোমার স্বরূপ শক্তি হইতে পৃথক নহে) জীবসমূহে যে হ্লাদকরী, তাপকরী এবং মিশ্রা এই ত্রিবিধ শক্তি আছে, তাহা তোমাতে নাই, কারণ প্রভাব নাই তোমাতে (সত্ত্ব রজঃও তমোময়ী যে প্রকৃতি বা গুণ,) তাহার এই ত্রিবিধ স্বরূপ শক্তির স্বরূপ কি ? তাহা ও শ্রীজীব গোস্বামী স্বয়ং এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন। যথা

"অত্র ক্রমাদুৎকর্ষেণ সন্ধিনী—সম্বিদ্—হ্লাদিন্যোজ্ঞেয়াঃ তত্র চ সতি ঘটানাং ঘটত্বমিব সর্ব্বেষাং সতাং বস্তূনাং প্রতীতেঃ নিমিত্ত মিতি ক্বচিৎ সত্তা স্বরূপত্বেন আম্নাতোঽপ্যসৌ ভগবান্ সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিত্যত্র সদ্রূপত্বেন ব্যপদিশ্যমানো যয়া সত্তাং দধাতি ধারয়তিচ, সা সর্ব্বদেশকালদ্রব্যাদি প্রাপ্তিকরী সন্ধিনী। তথা সম্বিদ্রূপোঽপি যয়া সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ সা সম্বিৎ।

তথা হ্লাদরূপোঽপি যয়া সম্বিদুৎকর্ষসাররূপয়া তং হ্লাদং সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ, সা হ্লাদিনী ইতি বিবেচনীয়ম্।" এই ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে ক্রমে সন্ধিনী হইতে সম্বিৎ, এবং সম্বিৎ হইতে হ্লাদিনী উৎকৃষ্ট, ইহা বুঝিতে হইবে।

হ্লাদিনীর সর্ব্বোৎকর্ষ সিদ্ধ হইলে পর, এক্ষণে যথাক্রমে এই তিনটী শক্তির স্বরূপ এইরূপ বুঝিতে হইবে।

ঘটসমূহের (প্রতীতির নিমিত্ত) যেমন ঘটত্ব হয়, সেইরূপ সত্তা সকল সদ্‌বস্তুর প্রতীতির নিমিত্ত বলিয়া, কোন স্থলে ভগবান্ সত্তাস্বরূপে উক্ত হইলেও "হে সৌম্য! এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎই ছিল"

এইরূপ শ্রুতিতে সদ্রূপে ব্যপদিষ্ট এই (ভগবান্) যে শক্তি দ্বারা সত্তাকে ধারণ করেন ও অপরবস্তু সকলকেও ধারণ করান, সেই শক্তির নাম সন্ধিনী।

সেই প্রকারে ভগবান্ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও যে শক্তির দ্বারা স্বয়ং জ্ঞানের আশ্রয় হয়েন এবং জীবসমূহকে ও জ্ঞানের আশ্রয় করিয়া থাকেন সেই শক্তিরই নাম সম্বিৎ।

এইরূপ ভগবান্ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়াও সম্বিৎ শক্তির উৎকর্ষের সার স্বরূপ যে শক্তি দ্বারা, সেই স্বরূপভূত আনন্দেব স্বয়ং অনুভব করেন এবং অপর জীব সকলকেও অনুভব করান্, সেই শক্তির নাম হ্লাদিনী।

হ্লাদিনীর ইহা হইল অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়, প্রকৃতোপ-যোগী হইবে বলিয়া, ইহার আরও একটু পরিচয় এখানে আবশ্যক।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীভগবানের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে লৌকিক প্রত্যক্ষ বা অনুমানাদি প্রমাণমাত্রের উপর নির্ভর করা যায় না, তাঁহার নিজের বাণী স্বরূপ যে বেদ এবং তন্মূলক শ্রুতার্থাপত্তিই এই বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। শ্রুতি বা উপনিষৎ স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিতেছে "আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ", "আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি: আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি"॥

"আনন্দকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন" "আনন্দ হইতেই এই প্রাণীনিচয় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, জন্মিয়া সেই আনন্দের দ্বারাই জীবিত থাকে, আবার প্রয়াণকালে সেই আনন্দেই মিশিয়া যায়"।

এই প্রকারের বহুশ্রুতি ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করে এবং সেই আনন্দরূপ ব্রহ্মকেই নিখিল প্রপঞ্চের উৎপত্তি ও স্থিতি প্রলয়ের হেতুরূপেও নির্দ্দেশ করে।

এই জাতীয় শ্রুতিরনির্দ্দেশ অনুসারে আনন্দরূপ ব্রহ্ম যে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়হেতু তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ হইয়াও নির্বিশেষ বা নিধর্ম্মক নহেন, যে হেতু তাঁহাতে প্রপঞ্চের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুত্ব অর্থাৎ সৃষ্টি প্রভৃতির অনুকূল শক্তিরূপ ধর্ম্ম সমূহ বিদ্যমান আছে। কোন শ্রুতি আবার বলিতেছে।

"ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে।
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাঽস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ"॥

তাঁহার কোন কার্য্যও নাই কার্য্যের উপযোগী কোন সাধন ও নাই, তাঁহার সমানও কেহ নাই, তাঁহা হইতে অধিক শক্তিশালীও কেহ নাই, নানাপ্রকার পরাশক্তিও তাঁহাতেই আছে ইহাও শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিকী। অথচ শ্রুতি তাঁহাকে রসও বলিতেছে। রসশব্দ কাহাকে বুঝায়, ইহা নিরূপণ করিতে যাইয়া রসশাস্ত্রের পরমাচার্য্য ভরতমুনির সুপ্রসিদ্ধ রস লক্ষণের ব্যাখ্যাতা ধ্বন্যালোককার আনন্দ বর্দ্ধনাচার্য্য এবং কাব্যপ্রকাশকার মম্মটভট্ট প্রভৃতি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যাহা আস্বাদরূপ হইয়াও আস্বাদ্য, যাহা জ্ঞান হইয়াও জ্ঞেয় যাহা সুখ হইয়াও সুখাস্বাদের নিদান, যাহা অনন্ত বৈচিত্র্যের আধার হইয়াও

একাকার স্ফূর্ত্তিস্বরূপ, যাহাকে কার্য্যও বলা যায়না, কারণ ও বলা চলে না, অথচ যাহা কার্য্যও বটে কারণও বটে, সেই সহৃদয়সম্বেদ্য-ব্রহ্মাস্বাদসহোদর-স্বয়ংপ্রকাশ-সম্বেদন বিশেষই রস।

প্রাকৃত স্ত্রীপুরুষরূপ আলম্বনকে করিয়া প্রাকৃত উদ্দীপন, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সংমিশ্রণে প্রাকৃত রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবই রসরূপে পরিণত হয়, সেই রস কিন্তু, অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়'না, এবং শাশ্বত শান্তির হেতু হয় না। কারণ, এই রস প্রাকৃত, এই প্রাকৃত রসের আস্বাদনে মানব আত্মা ভোগতৃষ্ণা হইতে বিরতি লাভও করিতে পারে না।

কিন্তু, শ্রুতি যে রসের কথা বলে, যাহারা তাহাকে একবারও এজীবনে আস্বাদন করে, তাহারা নবজীবন লাভ করে, এই রাগদ্বেষপূর্ণ সংসারের কোন ঝটিকাতেই সে আর বিচলিত হয় না, এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে—সে সংসারে থাকিয়াও সংসারী হয় না, সে জীবন্মুক্ত হয়।

এই রসরূপ শ্রীভগবান্ নিজে আনন্দ হইয়াও আনন্দের আস্বাদন করেন এবং করান, ইহা শ্রুতিরই নির্দ্দেশ, সুতরাং তাহাঁর নিজানন্দের অনুভব করিবার ও করাইবার কোন শক্তি বিশেষ যে তাহাঁতে আছে, তাহা এই শ্রুতিমূলক অর্থাপত্তি দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। লৌকিক রসের স্থায়ীভাব অনুরাগ বা রতি যাহার নাই বা যাহাতে অনভিব্যক্ত, সে যেমন লৌকিকরসের আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ এই অলৌকিক ভগবদ্রূপ রসের স্থায়ীভাব যে ভগবদ্বিষয়ক অনুরাগ বা রতি, তাহা যাহার নাই বা নিতান্ত অনভিব্যক্ত, সে এই রসরূপভগবানের আস্বাদন করিতে পারে না। আলঙ্কারিক-

গণের মতে যেমন ব্যঞ্জনা মনুষ্যমাত্রের হৃদয়ে সুপ্ত বা অনভিব্যক্ত রতিকে জাগাইয়া রসাস্বাদের অনুকূল করিয়া থাকে, ভক্তি শাস্ত্রের আচার্য্যগণের মতে সেইরূপ শ্রীভগবানের স্বাভাবিক শক্তি এই হ্লাদিনীই—ভক্তির অধিকারী মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে সুপ্ত বা অনভিব্যক্ত ভগবদ্বিষয়ক রতিকে জাগাইয়া ভগবদ্রূপ রসাস্বাদনের অনুকূল করিয়া তুলে।

এই রতি বা ভগবদ্বিষয়ক অনুরাগ মানব মাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহাই হইল কিন্তু, ভক্তি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভগবান্ই আনন্দ এবং সেই আনন্দরূপ নিজ আত্মাকে আস্বাদন করিবার এবং জীবমাত্রকে আস্বাদন করাইবার শক্তি হ্লাদিনী যে হেতু তাঁহাতে তাঁহারই স্বরূপভূত হইয়া সর্ব্বদা অবস্থিত, সেই কারণে ভগবদ্বিষয়ক অনুরাগ বা রতি সে জীব মাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এ সংসারে প্রাণী মাত্রেই সুখ চাহে এবং সেই সুখকে চাহার হেতু যে আসক্তি, তাহার নামই রতি, আমরা চলিত কথায় তাহাকে প্রেম বা ভালবাসা বলিয়া থাকি, তাহা কিন্তু, আমাদের আগন্তুক নৈমিত্তিক বা প্রাসঙ্গিক ধর্ম্ম নহে, তাহা আমাদের স্বাভাবিক সহজ বা স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। এই সংসারে প্রাকৃত বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত সুখের যে আকাংক্ষা, ইহাই আমাদের সংসারে সকল অনর্থের মূল, অথচ ইহাই আমাদের শাশ্বতিক শান্তি ও তৃপ্তিলাভেরও অপরিহার্য্য সাধন। যদি দেহে—আত্ম বুদ্ধি অথবা দেহ ও দেহসম্বন্ধী প্রাকৃত বস্তুতে মমত্ববুদ্ধি দ্বারা ইহা কার্য্যোন্মুখী হয়, তাহা হইলে, সুখের অতৃপ্ত আকাংক্ষাই এই সংসারে সকল প্রকার অনর্থ সৃষ্টির সাধন হয়, আর এই সুখাকাংক্ষাই যদি জীবের যাহা প্রকৃত

স্বরূপ, তদ্বিষয়িণী যথার্থ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে ইহাই আমাদের সর্ব্বানর্থনিবৃত্তির এবং সর্ব্বশ্রেয়ঃ প্রাপ্তিরও কারণ হয়। ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

শ্রুতিতে দেখা যায়

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়োহি ধীরো হভিপ্রেয়সোবৃণীতে
প্রেয়োমন্দোযোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥

কঠোপনিষৎ ১।২।২।

শ্রেয়ঃ (নিত্যসুখ) প্রেয়ঃ (সুখাভাস বা বৈষয়িক সুখ) মনুষ্যকে পাইয়া থাকে, অর্থাৎ মানুষের অন্তঃকরণে উদিত হইয়া থাকে, এই শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ কে পাইয়া ধীর ব্যক্তি বিচার দ্বারা ইহাদের মধ্যে কোনটী গ্রাহ্য আর কোনটী হেয়, তাহা নির্ণয় করিয়া লয়। বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি প্রেয়ঃকে উপেক্ষা করিয়া শ্রেয়ঃকেই বরণ করিয়া লয়। আর মূঢ়মতি প্রেয়কেই বরণ করিয়া লয়। সুখের আকাংক্ষার সহিত নিত্য সুখ ও ক্ষণিক সুখ এই উভয়েই বিষয় ভাবে মিলিত থাকে, এই কারণে প্রেয় ও শ্রেয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইয়াই মানুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ভ্রান্তি বশতঃ অধিক মানুষই প্রেয়কে ভালবাসিয়া থাকে, শ্রেয়কে ভালবাসে না, কিন্তু, ভগবদনু-গৃহীত কোন কোন ব্যক্তি বিচার করিয়া প্রেয়কে উপেক্ষা করে এবং শ্রেয়কেই ভালবাসিতে সমর্থ হয়। ইহাই এই শ্রুতি বাক্যটী স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছে। সকল প্রাণীকে ভগবৎস্বরূপ আনন্দ আস্বাদন করাইয়া চরিতার্থ করিবার জন্য, অতৃপ্ত সুখাকাংক্ষার বেশ ধরিয়া, করুণাময় শ্রীভগবানের

স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী জন্মের পর আমাদের প্রথম চৈতন্যের উন্মেষের সঙ্গেই অন্তঃকরণে সমুদিত হয় এবং মৃত্যুক্ষণ পর্য্যন্ত সকল সময়েই কখন স্ফুট—কখন অস্ফুটভাবে, আমাদের সকলেরই হৃদয় রাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়া থাকে।

এই অতৃপ্তিময়ী সুখভোগাকাংক্ষাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কোন মনুষ্যই ইহা হইতে বঞ্চিত নহে। বৈষ্ণব মহাকবি বিদ্যাপতি তাই গাহিয়াছেন।

"জনম অবধি হম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল। মধুরহি বোল শ্রবণহি শুননু, শ্রুতিপথে পরশ না গেল। লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখনু তবু হিয়া পরশ না গেল"। সুখের অভিব্যঞ্জক ভোগ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ, সংসারী জীব মাত্রেরই এই সন্নিকর্ষ হইতে যে প্রীতি বা আনন্দের স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা বেশীক্ষণ থাকে না, যতক্ষণ তাহা থাকে, সে পর্য্যন্ত আমরা নিজকে তৃপ্ত বলিয়া মনে করি, তাহার পরই সেই প্রীতি বা সুখের স্ফূর্ত্তি আবাব কিসে হয়, তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ি।

গীতাতে এই স্ফূর্ত্তিলোলুপ মানুষ মাত্রকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্‌ও অর্জ্জুনোপদেশের ব্যপদেশে বলিয়াছেন।

"যে তু সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥

ভোগ্য বিষয় অর্থাৎ অভীষ্ট প্রাপঞ্চিক বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে যে সকল সুখের স্ফুরণ হয়, তাহা সকলই পরিণামে দুঃখের নিদান হইয়া থাকে, কারণ, তাহাদের আদি ও অন্ত আছে। সুতরাং বিবেকী মানুষ তাহাতে আসক্ত হয় না।

প্রাপঞ্চিক সুখ ভোগের স্বভাব এই যে তাহা বিনশ্বর, সুতরাং তাহাতে আসক্তি থাকিলে তৃপ্তি হয় না, তাই তাহার অভাব হইলেই আবার তাহাকে পাইবার জন্য উৎকট ইচ্ছাও হইয়া থাকে। সেই ইচ্ছা যাবৎ পূর্ণ না হয় তাবৎ মানসিক উত্তেজনা ও ব্যাকুলতা হইয়া থাকে। এই উত্তেজনা ও ব্যাকুলতা বশতঃ ভোগ সাধনের সংগ্রহের জন্য আমাদিগকে নানা প্রকার কার্য্য করিতে হয়, কার্য্য করিতে গেলেও কায়িক বাচিক ও মানসিক পরিশ্রম অনিবার্য্য, এই পরিশ্রম ও দুঃখের সৃষ্টিকরে। পরিশ্রম যদি সার্থক না হয়, তবে তাহা মানসিক খেদ ও অবসাদের হেতু হয়, এই খেদ ও অবসাদ যে দুঃখের হেতু হয়, তাহা সংসারী ব্যক্তি মাত্রেরই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, ইহা আমরা সকলেই বুঝি, অথচ ইহার প্রতিকারের উপায় কি তাহা না বুঝিয়া, কখন কখন বা বুঝিয়াও, ভোগলালসার অদম্যতা বশতঃ তাহার অনুষ্ঠান করি না, ইহারই নাম সংসার, ইহাই ভোগাকাংক্ষাগ্রস্ত—কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা—প্রত্যেক মানবেরই দুরপনেয় ভববন্ধন, এই বন্ধন নিষ্কৃতির পথ কি তাহাই জানিবার জন্য বিদুর মহর্ষি মৈত্রেয়কে বিনীত ভাবে শ্রদ্ধার সহিত প্রশ্ন করিয়াছিলেন,

> "সুখায় কর্ম্মাণি করোতি লোকে
> ন তৈঃ সুখং বাহন্যদুপারমং বা।
> বিন্দেত ভূয়স্তত এব দুঃখং
> যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্নঃ" ॥

(শ্রীমদ্‌ভাগবত ৩।৫।২)

(লোকমাত্রই সুখ পাইবার আশায় বহু কর্ম্ম করিয়া থাকে কিন্তু, সেই কর্ম্ম সকলই যে সুখ লাভের হেতু হয়, তাহা দেখা

যায় না, তাহা হইতে দুঃখেরও বিরাম হয় না, প্রত্যুত, সেই সকল কর্ম্ম অনেক স্থলেই নানা দুঃখেরও সৃষ্টি করে, হে ভগবন্ এইরূপ অবস্থায় কি করা উচিত, তাহাই আপনি আমাদিগকে বুঝাইয়া বলুন।)

এই বিদুর প্রশ্নের চরম উত্তর শ্রীমদ্ভাগবতে নানা স্থানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত উত্তরটীই বিশেষ অবধানযোগ্য।

"তাবদ্ভয়ং দ্রবিণ দেহ সুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলম্
যাবন্নতেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥

(শ্রীভাগবত, ৩।৯।৬)

ধন শরীর ও সুহৃদ এই ত্রিবিধ বস্তুর বিয়োগ সম্ভাবনা হইতেই ভয় হয়। বিয়োগ বশতঃ শোক, শোকের পরে আবার স্পৃহা বা পাইবার জন্য উৎকট অভিলাষ। তাহার পরিণাম পরিভব, পরিভবেও বিপুল লোভ এই সকল অনর্থের যাহা মূল এবং যাহা সকল প্রকার মানস ক্লেশের হেতু, তাহা অস্থির বস্তুতে 'আমার ইহা' এইরূপ অভিমান, এই অভিমান সেই পর্য্যন্তই থাকে, যাবৎ লোকে হে ভগবন্ তোমার নিখিল ভয়হর চরণকে একমাত্র ত্রাণের উপায়রূপে বুঝিয়া আশ্রয়রূপে বরণ না করে।

এই শরণ লওয়া বা প্রপত্তি কেমনে হয়? ইহার এক মাত্র সদুত্তর শ্রুতিই দিয়াছে,

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মাবৃণুতে তনূং স্বাম্” ॥

(কঠবল্লী ২।২২॥)

এই আত্মাকে (পরব্রহ্মকে) ব্যাখ্যা করিয়া শাস্ত্রদ্বারা বুঝাইতে পারিলেই পাওয়া যায় না। যাহা শুনা যায় বা দেখা যায়, সেই সকলকে মনে ধরিয়া রাখিতে পারিলেই এই আত্মাকে পাওয়া যায় না। বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও তাঁহাকে ধরিতে পারা যায় না, কিন্তু এই আত্মাই যাহাকে আপনার জন বলিয়া বরণ করেন, সেই ব্যক্তিই ইঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহারই সমক্ষে ইনি নিজ মূর্ত্তিকে প্রকটিত করেন।

এই শ্রুতি এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত ভাগবতের শ্লোক দুইটী ভগবানের স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনীরই পরিচয় প্রদান করিতেছে। একটু প্রণিধানসহকারে দেখিলেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই যে মানবের হৃদয়ে সুখ ভোগের অদম্য আকাংক্ষা, ইহা প্রাণীমাত্রেরই আজন্ম সিদ্ধ আমরণ স্থায়ী স্বভাব, এই স্বভাবই আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে, আমাদের প্রত্যেকের অন্তঃকরণে হ্লাদিনী শ্রীভগবানের আনন্দঘন শ্রীমূর্ত্তিকে দেখাইয়া, আমাদিগকে সেই আনন্দ ভোগ করাইবার জন্য নিয়ত কার্য্য করিতেছে। মায়া শক্তির প্রভাবে পড়িয়া জীব আত্মস্বরূপ ভুলিয়া যায়, তাহার অন্তর্মুখী দৃষ্টি বহির্মুখীতে পরিণত হয়। অন্তরের নিত্য সিদ্ধ আনন্দকে সে প্রাকৃত বিষয়ের সহিত সম্পর্ক বিশেষের কার্য্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, এই মায়ার রাজ্য

হইতে তাহাকে বাহিরে আনিতে হইলে যাহা কিছু করা আবশ্যক, তাহা এই হ্লাদিনীই করিতেছে। কি ভাবে কাহাকে দ্বার করিয়া হ্লাদিনী এই জীবোদ্ধার রূপ মহাকার্য্য করিতেছে, তাহাও বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। এই যে অদম্য-অতৃপ্ত-সুখ ভোগের আকাংক্ষা, ইহা যতই বাধা প্রাপ্ত হইতেছে, ততই উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ইহা যতই প্রবল হইয়া উঠিতেছে বিমোহপ্রসবিনী মায়াশক্তি ততই চারিদিকে দুঃখের জাল বিস্তার করিয়া, তাহাকে অনন্ত কালের জন্য বাঁধিয়া রাখিবার উদ্যোগ করিতেছে, এই মায়া-রচিত বিপজ্জালে পড়িয়াও, আত্মোদ্ধারের কোন পথ দেখিতে না পাইয়া, জীব যখন একেবারে নিরাশ হইয়া পড়ে, নিজের সর্ব্বতোমুখী অসমর্থতা দেখিয়া ও ভাল করিয়া বুঝিয়া, যখন একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, তখন সে নিজের কর্ত্তৃত্বের প্রতি, নিজের জ্ঞাতৃত্বের প্রতি, ও নিজের ভোক্তৃত্বের প্রতি যে আজন্মসিদ্ধ বিশ্বাস, তাহা বিসর্জ্জন করে, বিসর্জ্জন করিয়া ভাবিতে আরম্ভ করে—এমন কি কেহ আছে? যে আমাকে এই ভয়াবহ বিপৎসঙ্কুল দুঃখসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিতে পারে? এই প্রকার যে আত্মত্রাণোপায় চিন্তার প্রথম উন্মেষ, ভক্তিশাস্ত্রে তাহারই নাম করুণাময় শ্রীভগবানের নিরুপাধিক করুণা। রস শাস্ত্রের আচার্য্যগণ ইহাকেই নির্ব্বেদ অর্থাৎ রতির সঞ্চারীভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই নির্ব্বেদ বা নির্ব্বেদরূপে মানব হৃদয়ে অভিব্যক্ত হ্লাদিনীর বৃত্তি যে শুভমুহূর্ত্তে মানব হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে, তখন হইতেই মানব প্রেমভক্তি লাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও ইহাই স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যথা—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃস্যাদ্
ঈশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াঽতো বুধ আভজেচ্চ তং
ভক্ত্যৈকয়েশংগুরুদেবতাত্মা" ॥

শ্রীভগবান্ হইতে যাহা ভিন্ন, তাহাতে যে অভিনিবেশ বা আসক্তি, তাহাই মানবকে ভগদ্বিমুখ করিয়া থাকে, তাহার পরিণাম হইয়া থাকে ভয়, এই সর্ব্ব প্রকার ভয়ের মূল কারণ শ্রীভগবানেরই (বহিরঙ্গশক্তি) মায়া, এই হেতু মানবের প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, সে যেন একমাত্র ভক্তির দ্বারাই তাঁহারই ভজন করে (কেমন করিয়া ভজন করিবে, তাহাই বলা হইতেছে) "গুরুদেবতাত্মা" অর্থাৎ গুরু এবং দেবতা (শ্রীভগবান্) তাহাই যাহার আত্মা (সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়) এই প্রকার গুরুদেবতাত্মা হইয়া মানব শ্রীভগবানের ভজন করিবে। এই শ্লোকে যে মায়া শব্দটী রহিয়াছে তাহা শ্লিষ্ট। অভিধানে উক্ত হইয়াছে মায়া শব্দের অর্থ দম্ভ এবং করুণা, দম্ভ শব্দের অর্থ অহমিকা, এই অহমিকা দেহেন্দ্রিয়প্রভৃতিতে আত্মাভিমানেরই কার্য্য, সুতরাং ইহা শ্রীভগবানের বহিরঙ্গ শক্তিমায়া হইতেই উৎপন্ন হয়, ভগবান্ হইতে পৃথক্ বস্তুতে যে আমাদিগের অভিনিবেশ ও তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বতোমুখ ভয়প্রভৃতিক্লেশ, তাহাও যেমন মায়া হইতেই উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ভগবদ্ ভজনের হেতু যে ঐকান্তিকী রতি, তাহাও মায়া শব্দের দ্বিতীয় অর্থ যে করুণা অর্থাৎ তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি বিশেষ, তাহা হইতেই

হইয়া থাকে, ইহাও তন্মায়য়া এই তৃতীয়ান্ত মায়া শব্দটীর দ্বারা সূচিত হইতেছে।

তাই চৈতন্য চরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে
"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হয়ে সেই বীজ করয়ে রোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জল করয়ে সেচন॥"

পূর্ব্বে যে 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ' এইরূপ শ্রুতি উপন্যস্ত হইয়াছে, তাহা যে শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তিরই একাংশের পরিচয় দিতেছে, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের আচার্য্যগণের এই প্রকার হ্লাদিনীর স্বরূপ বর্ণন, শ্রীসনাতন শ্রীরূপ এবং শ্রীজীব গোস্বামী ছাড়া তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বৈষ্ণবাচার্য্যের গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই স্থলে আরও একটী বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীভগবানের কৃপায় মানব হৃদয়ে যখন এই প্রকার নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, তখন তাহার সম্মুখে সাধনা মার্গে অগ্রসর হইবার জন্য দুইটী পরস্পর পৃথক্ পথ প্রতিভাত হইয়া থাকে। একটী জ্ঞান মার্গ অপরটী ভাবমার্গ। জ্ঞান মার্গে যাহাঁরা সাধনা করিয়া থাকেন, বৈরাগ্যকে তাঁহারা প্রধান সাধন বলিয়া মানেন, ভাবমার্গেও বৈরাগ্য প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞান মার্গের বৈরাগ্য ও ভাবমার্গের বৈরাগ্য এক নহে, কিন্তু পরস্পর বিভিন্ন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে জ্ঞানমার্গের বৈরাগ্য ফল্গু বৈরাগ্য এবং ভাবমার্গের বৈরাগ্য যুক্ত বৈরাগ্য।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু নামক স্বকৃত গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী এই দ্বিবিধ বৈরাগ্যেরই স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্য মুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিক তয়া বুদ্ধ্যা কৃষ্ণসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

প্রাপঞ্চিক বিষয় সমূহে আসক্তি নাই, অথচ দেহ ইন্দ্রিয় ও মনের হরি ভজনানুকুল সামর্থ্য বা স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে যে পরিমাণে প্রাপঞ্চিক বিষয়ের উপযোগ আবশ্যক, সেই পবিমাণে তাহাদের উপযোগ করিয়া, কৃষ্ণ সম্বন্ধেব ঘনিষ্ঠতা সম্পাদনেব জন্য মনের যে আগ্রহাতিশয়, তাহাই যুক্ত বৈরাগ্য, ইহাই ভাবমার্গের বৈরাগ্য।

প্রপঞ্চের বস্তু মাত্রই দুঃখের হেতু এই প্রকার বুদ্ধিবশতঃ আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মুক্তিকামীগণ কৃষ্ণ সম্বন্ধি বস্তুকেও যে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তাহা ফল্গু বৈরাগ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, ইহাই জ্ঞানমার্গের বৈরাগ্য।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ভাববিহীন জ্ঞানপ্রবণতার দ্বারা যাহারা এ সংসারে পরিচালিত হয়, তাহাদের সাধনা যতই সিদ্ধিব পথে অগ্রসর হয়, ততই তাহাদের নিকট জ্ঞেয় বস্তুমাত্রই স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় কল্পিত বলিয়া মনে হয়, তাহারা মনে করে এই-স্বপ্নসদৃশ কল্পিত বস্তুনিচয়ের উপর সত্যতার আরোপই সকল দুঃখের মূল, সুতরাং এই প্রাপঞ্চিক বস্তুমাত্রকে মিথ্যা বা কল্পিত সুতরাং হেয় বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারিলেই, সংসারে সকল দুঃখ-নিবৃত্তির পথ সুগম হয়, দুঃখ তাহাদের পক্ষে অসহনীয়, প্রপঞ্চের উপর

সত্যতাবোধ থাকিলে দুঃখ সম্বন্ধ অনিবার্য্য, সুতরাং পরমার্থ সদ্‌বস্তুর জ্ঞানই একমাত্র আশ্রয়ণীয়; সেইপরমার্থ সদ্ বস্তু জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর কিছুই হইতে পারে না। সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলেই এই মিথ্যা—এই অজ্ঞান-কল্পিত—এই সকল প্রকার দুঃখের হেতু প্রপঞ্চ—রজ্জুতে রজ্জুবুদ্ধির উদয়ে কল্পিত সর্পের ন্যায় আপনিই বিনষ্ট হইবে। এই প্রকার বুঝিয়া হেয়জ্ঞানে প্রপঞ্চ পরিত্যাগকেই মুমুক্ষু অর্থাৎ জ্ঞান মার্গের সাধকগণ বৈরাগ্য বলিয়া অবলম্বন করিয়া থাকেন, ভাবমার্গের বা ভক্তিমার্গের সাধকগণ তাহাকেই কিন্তু, ফল্গু বৈরাগ্য বলিয়া থাকেন॥

অচিন্ত্য ভেদাভেদসিদ্ধান্তই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে বৈশিষ্ট্য—ইহা যথাসম্ভব সংক্ষেপে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রদর্শিত হইল, এই সিদ্ধান্তরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে, যে সাধনা এবং উপাসনা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইযাছে, তাহার বিস্তৃত পরিচয় প্রদান এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে, যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণায় এই শেষ জীবনে সেই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবার শুভ সুযোগ উপস্থিত হয়, তবে তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাইবে, এই গ্রন্থের উপসংহারে ইহাই আমার সবিনয় নিবেদন। ইতি।

সমাপ্ত